উৎসর্গ

৺পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

লেখকের বক্তব্য

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক কোন আলোচনা পূর্বে আমাদের দেশে হয়নি। সম্ভবত 'রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন'ই এ সম্পর্কে প্রথম দীর্ঘ আলোচনা। পুস্তকের প্রথম তিনটি অধ্যায়মাত্র পূর্বে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের প্রায় সকল বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। প্রধানত 'শিক্ষাতত্ত্ব' ও 'শিক্ষণ-শিক্ষা' শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত হলেও সাধারণ পাঠকেরাও যাতে এর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন—এই উদ্দেশ্যে সরলভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি।

'মনুষ্যত্বের' বিকাশকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন ;— অর্থাৎ ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ—নিজের দিক থেকে এবং সমাজের দিক থেকে। স্বাদেশিকতা এই শিক্ষার ভিত্তি এবং মাতৃভাষা হ'ল বাহন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের সর্বত্র এই নীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষাসংস্কারের প্রচেষ্টা চলেছে তাতে এই নীতি প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। শিক্ষা সংস্কারের একটি মূলনীতি প্রায় সমস্ত সভ্যদেশেই গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে দেশের জাতীয় আদর্শকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা করা। এখানে অন্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এনে বসালে তার দ্বারা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

ভারতবর্ষেও আজ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। ঐ শিক্ষা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার অনুকরণ করে সফল হবে না। প্রায় দু'শ বছরের বিদেশী শাসনে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিজাতীয় ভাবধারা অনুপ্রবেশ করেছে, আজ তাকে ধীরে ধীরে পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কার করে যথাযোগ্য স্থানে নিয়ে আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ থেকে এই ব্যাপারে আমরা বোধ হয় কিছু সাহায্য পেতে পারি।

রবীন্দ্র শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্য একটি বিশেষ আদর্শের দিকে আমি এখানে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। তিনি শিক্ষককে বসিয়েছেন শিক্ষার কেন্দ্রে। কি চরিত্রগঠনে, কি শিক্ষাদানে সর্বত্রই গুরুর স্থান প্রধান। বিদ্যালয়কেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একেবারে মাঝখানটিতে স্থাপন করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র—সুতরাং ভারতবর্ষের আপন সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। বিদ্যালয়ে উপকরণের বাহুল্য

বর্জন করতে হবে, বৃহৎ অট্টালিকার লোভ ত্যাগ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় ঐগুলি বাহুল্যমাত্র।

শিক্ষার বিষয় নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন দেশীয় নীতি অবলম্বনে আপত্তি করেছেন। তিনি যে বিশেষ নীতির উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, শিক্ষণীয় বিষয়ে 'মনের প্রাণীন পদার্থ' থাকা চাই। মানব সংস্কৃতির যে বিষয়গুলি মানবমনে প্রেরণা দিতে পারে তাকেই তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভূত করতে চেয়েছেন। এর মধ্যে যেমন সংস্কৃত ভাষার স্থান আছে,—তেমনি বিজ্ঞানেরও স্থান আছে।

ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী যেরূপ জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন—তার একটি পূর্ণ আদর্শ 'রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনে' পেতে পারি—এই মনে করে এই পুস্তক লিখিত হয়েছে। 'শিক্ষাতত্ত্ব' ও 'শিক্ষণ-শিক্ষার' ছাত্রছাত্রীরা এই পুস্তক থেকে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাবেন—এই আশা করি। কিন্তু এই তত্ত্ব তাদের কাছে হয়তো কিছু নূতন বলে মনে হতে পারে; কারণ এতকাল শিক্ষাবিষয়ক মৌলিক তত্ত্বের জন্য আমরা য়ুরোপ ও আমেরিকার উপরই নির্ভর করে এসেছি।

এই পুস্তক প্রকাশে বহু বন্ধু নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে ধন্যবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে এই সম্পর্কে বিশেষ করে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিক বন্ধু অধ্যাপক সুশীল জানা পুস্তকখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য নানা বিষয়ে অমূল্য উপদেশ দিয়ে লেখককে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন। 'বিদ্যোদয় লাইব্রেরী'র শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকেই আপ্রাণ পরিশ্রম করে গ্রন্থখানি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নির্ভুলভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। তাঁদেরও আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ছাত্র ও বন্ধু শিশু-সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার উৎসাহ না থাকলে বইখানি এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা সম্ভব হোত না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ
১২১ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড
কলিকাতা ২৬

ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪ সাল।

ভূমিকা

রবীন্দ্র-প্রতিভা বর্তমান যুগের এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। মানব-সংস্কৃতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্র-মানস মহাসমুদ্রের মত গভীর ও অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার বিশেষ।

রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সৃষ্টির সঙ্গে এখনও আমাদের পূর্ণ পরিচয় স্থাপিত হয় নি। তার কারণ বোধ হয় কবি ও সাহিত্যিক হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমস্ত অন্তর অধিকার করে আছেন। কিন্তু কাব্য ও সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তা আজ আমাদের দেশের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ভাবে আলোচনার প্রয়োজন। বিশেষ করে 'শিক্ষানীতি' সম্পর্কে রবীন্দ্র-আদর্শ আজ আমাদের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষের উপর জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ. নির্ভর করে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপায় শিক্ষা'।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-আদর্শ নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও বিশ্বের কয়েকজন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল। এর কারণ বোধ হয় এতকাল বিজাতীয় শিক্ষার ফলে স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন আলোচনার প্রারম্ভে আমরা ঐ সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদের মতামত উল্লেখের প্রয়োজন অনুভব করছি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির প্রশংসা করে অধ্যাপক ফিণ্ডলে (J. J. Findley) তাঁর 'শিক্ষার ভিত্তি'[১] নামক গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন, তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিণ্ডলে উক্ত পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন এবং বিখ্যাত আমেরিকান শিক্ষাবিদ ডিউই-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করে বলেছেন,—

"আমাদের বর্তমান যুগে দুইজন বিখ্যাত মানুষের আবির্ভাব হয়েছে; পাশ্চাত্ত্য দেশে জন ডিউই এবং প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুইজনেই তাঁদের পাণ্ডিত্যের দ্বারা কেবল জনসাধারণকেই মুগ্ধ করেন নি, অধিকন্তু শিশুমনোরাজ্যেও প্রবেশ করেছেন। দুইজনেই এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু দুইজনেই তাঁদের উপযুক্ত বয়সে গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিদ্যালয় পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন।"

ঐ পুস্তকের অন্যত্র[২] ফিণ্ডলে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের মতে আশ্রম, তপোবন, নক্ষত্র, আকাশ, সঙ্গী এবং প্রতিবেশী—এই সামগ্রিক পরিবেশের সাহায্যে আমাদের অন্তরে আনন্দের আবির্ভাব হয়।"...

১। *The Foundation of Education :* Vol. II (1930), Page 237 by J. J. Findley.

এই অংশটি আমি প্রথম দেখি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিক্ষাসত্র' নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'শিক্ষাব্রতী' (রবীন্দ্র-সংখ্যা, ১৩৬১) নামক মাসিক পত্রে (অধুনালুপ্ত) প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত অংশটি এইরূপ :—

"There are two greatmen in our epoch, John Dewey in the West and Rabindranath Tagore in the East, whose wisdom not only illumines the general mind, but has stooped to the level of the children. Both men are now passing into old age, but it was in the prime of life, during the closing years of the last century, that both of them resolved to keep school." (Vol. II, Page 237)

২। "With Tagore, the environment, the Ashram, the star and the sky, friends and neighbours are the means whereby an inner happiness is fostered. Dewey seems to leave such influences to the subconscious ; his 'means where-

ফিগুলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ডিউই-এর শিক্ষাপদ্ধতির পার্থক্যও দেখিয়েছেন। কিন্তু দুই পদ্ধতির ভিতর যে একটি মূলগত ঐক্য আছে তা'ও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন: "তথাপি চিকাগো শহরের এবং বোলপুরের শিক্ষকদের মধ্যে একটা ঐক্যের যোগ আছে, কারণ উভয়েই ঐশ্বর্যের লোভ এবং আড়ম্বরকে জীবনের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছেন এবং শিশুজীবনের প্রতি নিজেদের গভীর দরদবোধের পরিচয়

by' the American boy and girl are to solve the riddle of life spring from impulses of curiosity and intelligence ; significance is found in relating the materials and tools of today with the unfurnished equipment of society in earlier epochs : pursuing the occupations presented in kitchen, garden and workshop, his children learned to enjoy the fellowship of their group, to be humane and considerate, without relating such sentiments either to the transcendental or to the sense of fellowship. You could not transplant the Santiniketan school song, 'She is our own ; the darling of our hearts' to Chicago, for the forms of art in which the Bengalee gives voice to his emotion are the outcome of ages of culture...... Yet the teachers in Chicago and the teachers in Bolpur were united both in their negations, in their rejection, e. g., of their vulgar pursuit of wealth and ostentation and in their positive sentiments towards the young. Both seek freedom from the sordid, fleeting desires of a materialistic age ; but the one escapes from the entanglements of a jungle where ancient truths have rotted in decay ; the other dumped on a marked shore, has to refashion the arts of life from the materials that lie to hand. 'Here and now is my America' is the motto of the West, for the past has been severed by the wide seas : the boys of Bolpur chant a sanskrit verse, *Om, Shanti, Shanti, Shanti*, on the soil their fathers trod. When Tagore delivered his lecture on *My School* to an American audience, we may be sure that it was left and understood best by those who had grasped the pedagogies of *School and Society* and of *Human Nature and Conduct*."
(*I bid :* Page 239—40)

দিয়েছেন। উভয়েই বর্তমানের জড়বাদী সভ্যতার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্তি চেয়েছেন।” ফিণ্ডলে আরও বলেছেন,—উভয়ের শিক্ষানীতির মূল ঐক্য স্পষ্ট বুঝা যায় যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের ‘আমার বিদ্যালয়’ (My School) সম্পর্কে আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা এবং জন ডিউই-এর বিখ্যাত পুস্তক ‘বিদ্যালয় ও সমাজ’ (School and Society) এবং ‘মনুষ্য প্রকৃতি ও আচরণ’ (Human Nature and Conduct) পুস্তক দুইখানি পাঠ এবং উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।

ফিণ্ডলে ইংলণ্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘শিক্ষাতত্ত্বের’ অধ্যাপক। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তিনি পুস্তকখানি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষভাবে প্রশংসা করেন আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম কিল-প্যাট্রিক। ১৯২৬ সালে তিনি শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-পরিবেশে শিশুশিক্ষার নূতন ব্যবস্থা দেখে তিনি খুশি হন। ১৯৩০ সালের ৪ঠা নভেম্বর তিনি নিউ ইয়র্কের International House-এ ‘ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এবং টেগোর বিদ্যালয়’ (Educational Situation in India and Tagore's School)[৩] সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন যে শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান বা Activity Principle-এর তিনি প্রশংসা করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্কুলবিভাগের পাঠক্রম এবং শিক্ষাপদ্ধতির জন্যও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কারণ, ঐ বিভাগে পরীক্ষা পাসের জন্য চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৩। বুনিয়াদি শিক্ষা এবং শিক্ষাসত্র—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শিক্ষাব্রতী, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৬১)।

উক্ত প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন P. C. Lal-এর *Reconstruction and Education in Rural India* (1932) পুস্তকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। কিলপ্যাট্রিকের বক্তৃতাটি তিনি পেয়েছেন শান্তিনিকেতনের শ্রীতনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট থেকে।

তিনি আরও বলেন,—"আমি আশা করি ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে এই পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির অবসান ঘোষণা করবে; কারণ এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে শিক্ষার্থীর আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সেই দিন আসবে এবং আমার মনে হয় কবিই হবেন তার প্রথম পথপ্রদর্শক।"

১৯১৭ সালে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' (স্যাডলার কমিশন) গঠিত হয়। স্যার মাইকেল স্যাডলার তার সভাপতি ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয় পরিদর্শন করে 'কমিশনের রিপোর্টে' নিম্নলিখিত মন্তব্যটি করেন। নানা কারণে ঐ মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, স্যাডলার যখন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন তখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শৈশব অবস্থা। বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখন সাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, দেশের জনসাধারণের নিকট যখন শান্তি-নিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয়ের রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি, তখন স্যাডলারের ন্যায় প্রখ্যাত বৃটিশ শিক্ষাবিদের নিকট এর তাৎপর্য ধরা পড়া বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তদীয় পিতৃদেবের অনুমতি প্রাপ্ত হন ১৯০১ সালে এবং ১৯২১ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে তা 'বিশ্বভারতী' নামে স্থাপিত হয়।[৪]

কমিশনের মন্তব্যটি নিম্নরূপ:

"বাংলাদেশে বিদ্যালয়কে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হয়। এর সামাজিক দিকটি অবহেলা করা হয়। শিশু যেমন বিদ্যালয় থেকে পাঠগ্রহণের দ্বারা শিক্ষালাভ করে, তেমনি সে শিক্ষালাভ করে বিদ্যালয়-সমাজের একজন সভ্য হয়ে। বিদ্যালয়ে এসে শিশুর অনুভব করা উচিত যে সে শুধু শিক্ষকের নিকট থেকে

৪। *The Visva-Bharati Quarterly :* Education Number—1947, Page 19

একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঠগ্রহণ করেই শিক্ষালাভ করবে তা নয়, অধিকন্তু বিদ্যালয়-সমাজের একজন সভ্য হয়ে, তার প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে, তার নানা কর্মে অংশ গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে নানাভাবে আপনার সংযোগ স্থাপন করে, দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে খুশী মনে শিক্ষালাভ করবে। এই ব্যবস্থা যে বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে অসম্ভব—এ কথা বলা চলে না। কারণ এইরূপ একটি সুন্দর ব্যবস্থা বোলপুরের বিদ্যালয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।'

কবিগুরু তাঁর সারা জীবন ধরে শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষাতত্ত্বের পরীক্ষা ও প্রবর্তন করেছেন, তা ১৯১৭ সনেও মাইকেল স্যাডলারের মত শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমরা দেখেছি যে পরে

৫। "In Bengal aschool is thought of too narrowly a place of instruction. Its possibilities as a society is overlooked. ......In any school the materials for an active and largely self-governing society lie ready to hand. There are the makings of a community in it. And through membership of a community, through bearing parts in its duties and pleasures, through learning how to obey and how to govern in it, a boy learns lessons which he needs not less than those which he gets by being punctual in class and diligent with his books at home. At school he ought to feel himself not a mere unit who has to learn things at an appointed time and place; not simply one of a multitude of similar units receiving instruction from his teachers; but a member of a community, responsible for service to it, an active participant in its various occupations, attached to it by a network of interests and responsibilities. It can not be said that this side of education is impracticable in India. To give one example alone, it is highly developed at Bolpur." (*Calcutta University Commission Report*)

লেখকের মন্তব্য : এই অংশটির উল্লেখ দেখি তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত Rabindranath's Contribution to Education in India নামক প্রবন্ধে। (*The Visva-Bharati Quarterly*—Page 19)

তা অধ্যাপক ফিণ্ডলে (১৯৩০) এবং কিলপ্যাট্রিকের (১৯২৬) মত শিক্ষাবিদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে। তার কারণ এই যে, শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ শিশুর সমাজের ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে জাতির জীবনে অন্নবস্ত্রের মত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন,—"অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপায় শিক্ষা; অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে।" জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কারণ হিসেবে শিক্ষার উপর এতটা নির্ভরতার জন্য তাঁকে একমাত্র জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ফিক্‌টে 'জার্মান নাগরিকদের প্রতি তাঁর ভাষণে'[৬] জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষাকেই একমাত্র মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে সকলকে আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর নানা লেখায় এবং বক্তৃতায় এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন। রাশিয়া পরিদর্শনের সময় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে যে বিবরণী প্রকাশ করেন—তা' থেকে বহু উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে।

"আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে,

৬। "The philosopher Fichte (1762-1814) in a series of 'Addresses to the German Nation' appealed to the leaders to turn to education to rescue the State from miseries which had overwhelmed it. Unable forcibly to resist and with every phase of the Government determined by a foreign conqueror, only education had been overlooked, he said, and to this the leaders should turn for national redemption.

Fichte's addresses stirred the thinkers among the German people as they had not been stirred since the days of the Reformation and a national reorganisation of education, with national ends in view, now took place.········Thus when in 1870, France was utterly defeated, it was remarked that the school-master of Prussia had at last triumphed." [Ellwood P. Cubberley : *History of Education*]

যারা মূঢ় ছিল—তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত। যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক। যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল—তারা আজ সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা' কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণ মাত্রায়।" (রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ৩৯)

"ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।" (ঐ—পৃঃ ৫৮)

"জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্র-শক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমান তুরস্ক প্রবল বেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে।" (ঐ—পৃঃ ৫৯)

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবল মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যও এদের সমান চেষ্টা।" (ঐ—পৃঃ ৬৮)

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে দেশের কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"দেশের সৌভাগ্য-সৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের

প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষার দ্বারা আকৃষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির একমাত্র উপায়।"[৭] (রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ১০৬)

৭। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা সংস্কার' নামক প্রবন্ধে উক্ত উক্তির সমর্থনে টলস্টয়ের একটি বাণী উদ্ধৃত করেছেন।* ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষা-সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo-educational establishment which it controls : Schools, High Schools, Universities, Academies and all kinds of Committees and Congresses. But good is good and enlightenment is enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened.···And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on this struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make." (শিক্ষা—পৃঃ ৪২)

রবীন্দ্র জীবন-দর্শন

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনকে বুঝতে গেলে রবীন্দ্র জীবন-দর্শন সম্পর্কে কিছু পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কী মহান বাণী রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন কাব্যে, প্রবন্ধে ও আলোচনায় রেখে গিয়েছেন, একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের যে আলোক তাঁর শিক্ষা-দর্শনকে প্রভাবিত করেছে আমরা এই অংশে তার একটু আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের মূল সত্যটিকে সংক্ষেপে বলতে গেলে এই ভাবে বলতে হয়—উপনিষদের যে বাণী, রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনে সেই বাণীকেই পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এই সত্য ঐক্য-বোধের দ্বারা মহিমান্বিত, বিচ্ছেদের দ্বারা নয়; এই সত্য ত্যাগের দ্বারা অলঙ্কৃত, ভোগের দ্বারা, লোভের দ্বারা খণ্ডিত নয়; জীবনের পরমবিশ্বাসের দ্বারা এই সত্য মানুষকে পরিচালিত করে, অবিশ্বাসের দ্বারা নয়।

অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তাঁর হৃদয়ের আবেগ তিনি তাঁর কাব্যে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। বস্তু ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান কবির কাছে আমরা কি ভাবে আশা করতে পারি! কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিকেরা জানেন একটি নিজস্ব জীবন-বোধের দ্বারা কবির সমগ্র চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত। এই জীবন-বোধই তাঁর জীবন-দর্শন। কবির জীবন-দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে প্রথমেই ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর মতামত আলোচনা প্রয়োজন।

শঙ্করের দার্শনিক মত অনুযায়ী কবি ঈশ্বরকে 'Absolute Being' বা নির্গুণ সত্তা হিসাবে দেখেন নি। বিশ্বের নানা বৈচিত্র্যের মাঝে তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে কবি নিজের জীবনে যখন উপলব্ধি করেছেন, তখন তিনি এর মাঝে 'জীবন দেবতা'র লীলাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

যেমন,—

"রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু মর্মরে ছায়ার খেলায়,
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাষি।"

কিন্তু এই দেবতা যে নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্ম নয় তা কবি নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর The Religion of Man গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন—

"But as our religion can only have its significance in its phenomenal world comprehended by our human self, this absolute conception of Brahman is outside the subject of my discussion."

কবি ঈশ্বরকে দেখেছেন এইভাবে যে তিনি বিশ্বের নানা কর্মে নিজেকে প্রকাশ করছেন। কবির ঈশ্বর,—যাঁকে তিনি 'জীবন দেবতা' বা 'অরূপ' নামে নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন—তিনি চলমান, গতিশীল, বিশ্বের নানা সৃষ্টির মাঝে বিচিত্র ভাবে প্রকাশমান। তাই কবি বলেছেন—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র রূপিণী।
* * * * * *
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।"

জগতের বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে কবি পরমব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন আনন্দ উপলব্ধির ভিতর দিয়ে। তিনি তাঁর 'সাহিত্যের কথা' নামক পুস্তকে এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। একথা আমাদেরই দেশের সবচেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত

বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে। * * * * যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকে চলিয়াছে, ধুকিতে ধুকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার জন্য নহে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্ম' নামক গ্রন্থে বলেছেন—"ঈশ্বর সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না—হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিঃশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়; বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।" (ধর্ম—পৃঃ ৩৪)

তাই দেখি কবি তাঁর হৃদয়-শতদল উন্মীলন করে বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মাঝে সেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন। "যখন সেই সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

'পথের সঞ্চয়ে' 'আনন্দরূপ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সুন্দর করে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন।

"আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, আকাশের পাণ্ডুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃদুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল—'এই তো তাঁহার প্রসাদ সুধার প্রবাহ'।

"সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না।......কিন্তু সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেই দিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান

গাহিয়া উঠে, 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে—এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা'।

"আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই যে অনির্বচনীয় মাধুর্য্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্‌খানে।······ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্‌। রূপ এখানে শেষ কথা নহে। মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই-যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত। শুধু রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম। বস্তুকে দেখিলাম সত্যকে দেখিলাম না।

"আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে। আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই। সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া আছি, তখনি দেখিতে পাই······বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাহার মধ্যে আছে।

······"এই যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই যে অপরিসীম সত্য, এই যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে সে কি ভয়ানক ব্যর্থতা, কি মহতী বিনষ্টি।"

প্রকৃতির অপূর্ব বৈচিত্র্যের মাঝে, সৌন্দর্যের মাঝে কবি এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের সন্ধান পেয়ে উপলব্ধি করছেন,—"ইহা সে অখণ্ডেরই নানা প্রকাশ।······তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক।"[১]

কিন্তু একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝেই ঈশ্বর প্রকাশিত নন; ঈশ্বরের প্রকাশকে উপনিষদ তিন ভাগে ভাগ করে দেখেছেন। "একটি প্রকাশ জগতের মাঝে; আর একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।" (ধর্ম—পৃঃ ৯৮)

১। রবীন্দ্র রচনাবলী (২৬শ খণ্ড)—পৃঃ ৪৯৬

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকলে প্রকাশিত হতে পারেন না; এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ সর্বদা ঘূর্ণায়মান ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যে তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করে আছেন বলেই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁর প্রকাশ কেমনে সম্ভব!

শিবম্ কেবল আপনাতেই স্থির নন। সংসারের সকল প্রকার দুঃখ ও চেষ্টার মধ্যে, কর্মক্লেশের মধ্যে অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করছেন। সংসারের সমস্ত দুঃখতাপকে অতিক্রম করে মঙ্গলরূপে ধর্মরূপে তিনি সমস্ত কিছু আবৃত করে আছেন।

আমাদের চিত্ত সংসারে নানা প্রকার আপন-পরের ভেদ-বৈচিত্র্যের দ্বারা ক্লিষ্ট হচ্ছে, আহত-প্রতিহত হচ্ছে। সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার 'অদ্বৈতস্বরূপ' প্রকাশ করছেন। সংসারে পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য রয়েছে, বিভেদ রয়েছে, দ্বন্দ্ব রয়েছে, আমরা প্রেমের দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা সেই বিভেদের মধ্যে ঐক্যবোধের সেতু রচনা করছি।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি।" (ধর্ম—পৃঃ ৯৯)

এই চাঞ্চল্যের মধ্যে শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম—এই তিনের সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা। আমাদের সকল কর্ম এই তিনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

উপরের আলোচনায় আমরা রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের একটি পরিপূর্ণ রূপের সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছি। জগতের নানা বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনের মাঝে তিনি যে আনন্দের প্রকাশ দেখেছেন, তা নানা-ভাবে কবির চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রাচীনকালের ভারতীয় দার্শনিকদের সঙ্গে অবশ্যই তাঁর চিন্তার পার্থক্য আছে।

ভারতীয় দার্শনিকদের ধারণা যে সত্য স্থির। শংকরাচার্য সত্যের লক্ষণ নির্দেশ করে গেছেন—'কালত্রয়াবাধিতম্ সত্যম্'—যা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালে সমভাবে অবস্থিতি করে, যার কোনো কালেও কোনো পরিবর্তন হয় না—তাহাই সত্য। কিন্তু হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের মতে দর্শনের বাণী হচ্ছে যে, সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নয়; গতিহীন জড়বস্তু কখনই সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রত্যেক বাক্যে এই গতির মাহাত্ম্যই প্রচার করেছেন।

তিনি বলেছেন,—

"জগৎ-স্রোতে ভেসে চল' যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবিশশী চল'রে সেথা যাই।"

অথবা,

"আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
* * *
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে এই পথেরি বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা, পথে যেতেই ভালবাসা,
পথে-চলার নিত্য রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি॥" (গীতালি—পথিক)

আমরা দেখেছি কবি এই চলমান জগতের দৃশ্যনিচয়ের মধ্যে তাঁর জীবনদেবতাকে আনন্দরূপে দেখেছেন। তাই তাঁর এই চলা শুধু পথ চলাই নয়। এর মাঝে তিনি উপলব্ধি করেছেন 'পান্থজনের সখাকে'।

"পান্থ তুমি, পান্থজনের সখাহে
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।" (গীতালি—পথের গান)

'পান্থজনের সখা যিনি'—তিনিই 'জীবন-রথের সারথি'। তাই পথিক কবি বলছেন—"পথের সাথি, নমি বারম্বার, পথিক জনের লহ নমস্কার"।

রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের এই গতীয় (Dynamic) চিন্তাধারা উপনিষদের 'চরৈবতি' মন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'আগে চল আগে চল ভাই'— এই কবিতায় তিনি বোধ হয় এই চলার কথাটাই বলেছেন। সমস্ত বিশ্বসংসারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই গতির বেগ অনুভব করেছেন। তিনি তাঁর 'বলাকা' কবিতায় বলছেন—

"মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।"

অথবা,

"শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির-আঁধার-নিচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।"

রবীন্দ্রনাথের মতে সমস্ত জগৎ-প্রকৃতি একটি প্রচণ্ড শক্তি, একটি গতির দ্বারা প্রতিনিয়ত কম্পিত হচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্য তো এই প্রচণ্ড শক্তিরই ফল। এই ভয়ঙ্কর শক্তি, এই প্রচণ্ড গতিকে মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, যদি মানুষ একে একমাত্র শক্তি ও গতিরূপে দেখে। বিশ্বজগতের মঙ্গলের মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য বুঝতে পেরে সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়। কবির আপন ভাষায় বিষয়টির ব্যাখ্যা এইরূপ:

"এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ যিনি শান্তং তিনিই শিবম্। এই শান্ত-স্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দাম শক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গল লক্ষ্যের

দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিখিল-জগৎ কে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোট হইতে বড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধুলিকণাটুকুও লক্ষ যোজন দূরবর্তী সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার, এক বিরাট কলেবর রূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ, তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালন সূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি, সেই পালনী শক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার একরূপ, ক্ষতি তাহার একরূপ, দুঃখ তাহার একরূপ; সেই মৃত্যু ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে।"

(ধর্ম—পৃঃ ১১৫—১১৬)

রবীন্দ্রনাথের মতে ঈশ্বরের আর একটি প্রকাশ মানবসমাজে। "মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয় সমাজপ্রকৃতি বলে আর একটা আশ্রয় আছে।"—(শান্তিনিকেতন—পৃঃ ১৪০) তাই ঈশ্বরের উপলব্ধি সমাজের মধ্যে থেকেও মানুষ পেতে পারে।

কিন্তু মানুষকে যখন আমরা সমাজের মধ্যে দেখি, তখন দেখি দুটি শক্তির মাঝে সে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে সে স্বতন্ত্র, আর-একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। একদিকে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির তাড়না, অন্য দিকে সামাজিক দাবি। এই দুইএর মাঝে সামঞ্জস্য সাধনই তার মনুষ্যত্বের সাধনা। এই প্রসঙ্গে 'শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

"মানুষকে একই সঙ্গে দু'টি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দু'টির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়।"

মনুষ্যসমাজে ব্যক্তিকে ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করে রাখে প্রেমের সম্পর্ক। আমরা যাকে ভালবাসি তার জন্য স্বার্থ ত্যাগে আমাদের কষ্ট হয় না, বরং আমরা আনন্দিত হই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঈশ্বর প্রেমরূপে সমাজে, পরিবারে, মানুষের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন। মানুষকে ভালবাসার মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাব। সমাজে, পরিবারে মানুষের সাধনা হচ্ছে এই ভালবাসার সাধনা।

মানুষ নিজেকে ব্যক্ত করতে চায় এবং এই ব্যক্ত করবার চেষ্টার ভিতর দিয়েই তার আমিত্বের অহঙ্কার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতে পারে, তখন থেকেই তার বড়ো হবার চেষ্টা শুরু হয়। এই বড়ো হবার জন্য তাকে নিজের প্রবৃত্তিকে, বাসনাকে খর্ব করতে হয়। মানুষের যে সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো ক'রে পরকে আঘাত করে, তাকে কেবলি খর্ব করতে হয়, নষ্ট করতে হয়। তার যে সকল প্রবৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা চর্চার দ্বারা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে তুলতে হয়। "পরিবার-বোধের চেয়ে সমাজ-বোধে, সমাজ-বোধের চেয়ে স্বদেশ-বোধে মানুষ একদিকে যতই বড়ো হয়, অন্যদিকে ততই তাকে আত্ম-বিলোপ সাধন করতে হয়,—ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হয়।"

(শান্তিনিকেতন—পৃঃ ৩৭৮)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের কর্মক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। মানুষ বহু সাধনার সাহায্যে আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে, এবং নিজেকে সমাজের মঙ্গল কর্মের অনুবর্তী করে। এই ভাবে তার চরিত্রও বৃহৎ সমাজধর্মের অনুকূল হয়। "শুধু চরিত্রে

এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে ; ভালবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে।” (শান্তিনিকেতন—পৃঃ ৪০২)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্ব-জগতের গোড়ার কথা। সৃষ্টির যে লীলা, তার একদিকে আবরণ আর-একদিকে প্রকাশ।” (বিশ্বভারতী—পৃঃ ৫৯)

বিকাশই যদি মানুষের ধর্ম হয়, তবে এই জগৎ সংসারে মানুষের আপন সত্য স্থানটি কি? একটি বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্যই কি আমরা জন্মগ্রহণ করেছি? আমাদের যাত্রাপথের শেষ লক্ষ্যটি কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারদের বাণী উল্লেখ করে এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো।[১] মানুষের আত্মাকে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ অত্যন্ত বড়ো করে দেখেছেন। ‘মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না। ব্রহ্মের মধ্যেই তার সমাপ্তি।’ মানুষকে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা চিহ্নিত করে দেখলে আমরা মানুষকে খাটো করে দেখি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—“সমস্ত কামনা বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়ো। মানুষের সেই-যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে।” (ধর্ম—পৃঃ ১৩৫)

উপনিষদ বলেছেন—“হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম”,—হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। মানুষ এই

১। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

কথা জানতে পেরেছে। তাই তার সাধনা হচ্ছে সত্যকে জানার। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজন্য উপনিষদ আবার বলছেন—"তৎত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।"—(ঈশোপনিষৎ) অর্থাৎ, "হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।"

মানুষ যে এই কথা বলতে পেরেছে—তার কারণ মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেয় তার চরম নয়। তার সাধনা মনুষ্যত্ব লাভের সাধনা, তার সাধনা আপন আত্মাকে অনন্তজীবনের দিকে চালনা করবার সাধনা।

উপরের আলোচনায় রবীন্দ্র জীবন-দর্শনে ঈশ্বরের তাৎপর্য বুঝবার এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ণয়ে চেষ্টা করেছি। 'জীবন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত এই যে "বাহিরের শক্তির সহিত ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্য ক্রিয়াই জীবনের লক্ষণ।" (ধর্ম—পৃঃ ১৪৭)

গাছপালার মধ্যে এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মতো ঘটে। আলোকের, বাতাসের, খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তার প্রাণের কাজ চলতে থাকে। সাধারণভাবে দেখলে মানুষের জীবনেও প্রাণক্রিয়ার কাজ এই ভাবে চলে।

কিন্তু মনুষ্যজীবনে 'মন' নামে, 'ইচ্ছা' নামে আরও একটি পদার্থ যোগ হওয়ায়, তার পক্ষে প্রাণের ক্রিয়া আরও জটিল হয়ে পড়েছে। খাদ্যগ্রহণের অন্যান্য উত্তেজনার সঙ্গে খাদ্যগ্রহণের আনন্দও মানুষ ভোগ করতে চায়। এর তাৎপর্য এই যে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে আমাদের একটি মানসিক সম্বন্ধও বেড়ে গেছে। "দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটছে, আবার তার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটছে।" এর ফলে বিশ্বশক্তির সঙ্গে মানুষের জীবন-শক্তির সামঞ্জস্য সাধন জটিল হয়ে পড়েছে। এই সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে, এবং এই জন্য বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে মানুষ যদি শান্তভাবে আপনার

সত্য স্থানটি খুঁজে নিতে পারে, বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে চলতে পারে তবেই তার জীবন-ক্রিয়া ঠিকমতো চলতে থাকে, সে বৃদ্ধির পথে বিকাশের পথে আপনাকে চালিত করতে পারে। কিন্তু যখনই এই সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে তখনই তার প্রাণক্রিয়ারও সমাপ্তি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি রবীন্দ্র-মানসের 'দার্শনিক তত্ত্ব' সর্বত্রই দ্বন্দ্বময় উপলব্ধির দ্বারা সমাকীর্ণ। কবি স্বয়ং 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তাঁর উপলব্ধির পশ্চাতের দ্বান্দ্বিক গতিশীলতার কথা ব্যক্ত করেছেন।

"যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়। কেন না এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। ··· কিন্তু এই মিলটিতে আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেন না, আমাদের চিত্ত আছে সেও আপনার একটা বড় মিল চায়। এ মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। ··· যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রার' "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। ··· এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব চিত্তের ঘাতপ্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল ? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। ··· তারপর আমার রচনায় বারবার এই ভাবটা—জীবনে এই দুঃখ .বিপদ বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।"

রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্ববাদের প্রকৃত তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন অন্যভাবে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে। মানুষকে বিভিন্ন বৈপরীত্যের মাঝে সামঞ্জস্য সাধনের দুরূহ সাধনায় চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্য সাধনেরই ইতিহাস। যতকিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সমস্তই হচ্ছে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয় চেষ্টার বিচিত্রফল।

তাই রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন,—"দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ এবং এই দুঃখই হচ্ছে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাকস্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিসের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে ; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে—ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্য সাধনের জন্যে তাকে দুঃখ পেতে হয় না।...

"মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে ; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আমার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।"

এই সমস্তই হেগেলীয় চিন্তাধারার কথা। হেগেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবশ্য পার্থক্যও আছে। হেগেলের নিকট তাঁর Absolute এক পরিণামমুখী, পরিবর্তনরূপী, স্বতঃ-পূর্ণসত্তা (Perfection) নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন—শান্ত শিব এবং অদ্বৈত। উপনিষদের কথায় "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের বৈচিত্র্যের মাঝে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের মাঝে, সামাজিক সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব ও বিভেদের মাঝে, গ্রহ নক্ষত্র ও বস্তুনিচয়ের গতির মাঝে তিনি উপলব্ধি করেছেন—সেই পরম একজে। এই সম্পর্কে উপনিষদ বলেছেন—

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।"

অর্থাৎ, বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে, সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ। (ধর্ম—পৃঃ ৪৪)

অথবা,

"এক ধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।"

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে। (ধর্ম—পৃঃ ৪৫)

রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের প্রকৃত রূপটি ধরতে হলে ধর্ম সম্পর্কে কবির মতামত বিশেষভাবে জানা দরকার। আমরা একথা বলতে পারি যে রবীন্দ্র-ধর্মের একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে। তাঁর মন উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও উপনিষদের বাণী তিনি আপন মনের আলোকে যাচাই করে নিয়েছেন। এইটিই কবি-ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর Religion of Man গ্রন্থের একস্থানে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"During the discussion of my own religious experience I have expressed my belief that the first stage of my realisation was through my feeling of intimacy with Nature ···"

"It is evident that my religion is a poet's religion and neither that of an orthodox man of piety, nor that of a theologian. Its touch comes to me through the same unseen and trackless channel as does the inspiration of my songs. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other and through their betrothal had a long period of ceremony it was kept secret to me."

আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি সত্যকে 'প্রত্যক্ষদর্শী' এবং স্বকীয় অভিজ্ঞতা ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য নয় একথা উল্লেখ করেছেন,—

"If there be some truth which has no sensous or rational relation to the human mind it will remain as nothing as long as we remain human beings."

রবীন্দ্র আত্মদর্শন নিয়ে এখনও ব্যাপক কোনো আলোচনা হয় নি। কবির বিভিন্ন কাব্য, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন লেখা প্রভৃতি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে কবি-মনের একটি বিশেষ দার্শনিক গঠন লক্ষ্য করা যায়। উপরের আলোচনায় আমরা রবীন্দ্র-মানসের সেই দার্শনিক গঠনের রূপ নির্ণয়ে চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন তাঁর জীবন-দর্শন দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছে তা বুঝতে গেলে এটি জানা বিশেষ দরকার। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্র-দর্শনের মূল বিষয়গুলি পুনরায় এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

(১) রবীন্দ্র-দর্শন উপনিষদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও, কবি এর ব্যাখ্যা নিজের মনের আলোকে যাচাই করে গ্রহণ করেছেন।

(২) ব্রহ্ম সম্পর্কে কবির ধারণা এই যে তিনি নির্গুণ সত্তা নন, তিনি তাঁর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সতত প্রকাশশীল। কিন্তু এই বিশ্বে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়েছে নানাভাবে; একটি প্রকাশ জগতের মাঝে, আর একটি প্রকাশ মানবসমাজে এবং অন্যভাবে তাঁর প্রকাশ মানব-আত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

(৩) বিশ্ববৈচিত্র্যের মাঝে ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন একটি সমগ্র নিয়ম (Law) রূপে। বিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ, বস্তুনিচয়ের প্রচণ্ড গতি এবং পরিবর্তনের মধ্যে একটি গাণিতিক নিয়মের (Mathematical Law) বন্ধনরূপে তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করছেন। এই নিয়মকে জেনে আনন্দরূপে তাঁকে লাভ করাই মনুষ্য জীবনের সাধনা।

(৪) সমাজে বহুস্বার্থের এবং অনৈক্যের মধ্যে তিনি 'প্রেম'রূপে সকলকে একত্রে বেঁধে রেখেছেন। সমাজে, গৃহে এবং আপন দেশে আমরা পরস্পরকে ভালবেসে ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাঁকে লাভ করতে পারি।

বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশ হয়েছে আত্মারূপে। 'আত্মবোধ' লাভ করে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে লাভ করতে পারি।

(৫) বিকাশই হচ্ছে জীবজগতের ধর্ম। পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যেই জীব আনন্দ লাভ করে। মানুষের পক্ষে এই বিকাশ সহজ নয়। মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর পার্থক্য এই যে মানুষকে চেষ্টার সাহায্যে, তপস্যার সাহায্যে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। বিশ্ব-প্রকৃতির ক্ষেত্রে নিয়মকে জেনে, সমাজের ক্ষেত্রে আপনাকে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত করে মানুষ নিজেকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে।

(৬) বিশ্ব, সমাজ এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিকাশের নিয়মকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন দ্বান্দ্বিক মতবাদের সাহায্যে। "সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্য সাধনেরই ইতিহাস। যত কিছু অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্য শিল্প সমস্তই হচ্ছে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয় চেষ্টার বিচিত্র ফল।"

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন

রবীন্দ্র জীবন-দর্শন তাঁর শিক্ষা-দর্শনকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে এইবার বোধ হয় তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রত্যেক দেশে প্রতিভাশালী মানুষেরা, জাতির আচার্যেরা চিন্তা করেন, নূতন তত্ত্ব সৃষ্টি করেন এবং দেশের রাষ্ট্রশক্তি বা প্রভাবশালী রাজনীতিকেরা ওই তত্ত্বের রূপদানের জন্য সংগঠন সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য দেশীয় শিক্ষাবিদ পেস্তালৎসীর মতো তত্ত্ব ও সংগঠনের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক রুশো প্রভৃতির মতো তিনি কেবলমাত্র নূতন চিন্তা সৃষ্টি করেন নি,—তাঁর চিন্তাকে তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রমের মাঝে রূপ দিয়েছেন, পরীক্ষা করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে আমরা কেবল কবির কল্পনা বলে পরিহার করতে পারি না। যদিও তিনি বলেছেন—"আমার এই কথাটি কেজো কথা নহে। ইহা কল্পনা।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতালি চলিয়াছে। সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।”

পূর্বেই বলেছি আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ব্যবহারিক ও বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনকে বিচার করা ও আলোচনা করা। বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে আমরা কতটুকু দেশের জন্য গ্রহণ করতে পারি—এই প্রশ্নের বিচার আজ আমাদের করা প্রয়োজন।

শিক্ষাতত্ত্বকে বিচার করতে হলে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার বিচার প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশের বিদ্যালয় তার জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ (Institution); শিক্ষাদান কার্য একটি বিশেষ সামাজিক কার্য। এই কার্যে একটি মন আর একটি মন দ্বারা আলোকিত হয়। এই কার্যের এক দিকে রয়েছেন শিক্ষক, অন্য দিকে রয়েছে শিক্ষার্থী। শিক্ষাদানের উৎকর্য নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষক, যোগ্য শিক্ষার্থী—এই দুইএর সাহচর্যে। শিক্ষাদান একটি বিরাট কর্মযোগ; এই কর্মযোগে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অংশ প্রধান হলেও অন্যান্য বিষয়েরও প্রভাব কম নয়। এই সামাজিক কার্যে চাই উপযুক্ত পরিবেশ, উপযুক্ত বিষয়বস্তু এবং শিক্ষা প্রদানের মনস্তত্ত্ব সম্মত পদ্ধতি। একটি বিশেষ লক্ষ্যদ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষা-সংগঠক এবং শিক্ষক উভয়ের নিকট লক্ষ্যের স্পষ্টতা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং কারুর শিক্ষাতত্ত্বকে বুঝতে হলে উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে হবে। অর্থাৎ, (১) শিক্ষার লক্ষ্য, (২) শিক্ষার ভিত্তি, (৩) শিক্ষার পরিবেশ, (৪) শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য, (৫) শিক্ষকের যোগ্যতা, (৬) শিক্ষার বিষয়, (৭) শিক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বকে বিচার করার প্রয়োজন আছে।

মানুষের জীবন সম্পর্কিত ধারণা তার শিক্ষা-দর্শনকেও নিয়ন্ত্রিত করে। কবিও তার ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের রূপ ও গতি নির্ণয়ে এই ধারণা বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলে একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ভাববাদী (Idealist) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেও, বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে দর্শনের প্রয়োগ করেছেন স্বভাববাদী (Naturalist) দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। এই বিষয়ে আমেরিকার জন ডিউই-এর সঙ্গে তাঁর অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ডিউই-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ত পরিবর্তনশীল, প্রয়োগফলের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য এই নূতন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির নামকরণ করা হয়েছে প্রয়োগবাদী (Pragmatist) দর্শনরূপে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 'ভাববাদ' এবং 'প্রকৃতিবাদে'র যে ভাবে মিশ্রণ হয়েছে, ডিউই-এর ক্ষেত্রে তার ভিন্ন রূপ দেখি। তার কারণ বোধ হয় উভয়ের ক্ষেত্রে জীবন-দর্শনের রূপ বিভিন্ন এবং 'শিক্ষা-দর্শন' জীবন-দর্শনেরই একটা ব্যবহারিক দিক।

শিক্ষার লক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথের মতে জীবনের যা লক্ষ্য, শিক্ষারও লক্ষ্য তা'ই। "শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং কী শিখিব, এ দুটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যতো বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশী ধরে না।" (শিক্ষা—পৃঃ ১৭১)

সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্যের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনের লক্ষ্যের কথা আলোচনাও বিধেয়। আমরা যে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে অক্ষম হই, তার কারণ আমরা জীবনের মূল লক্ষ্য কি তা ভাল করে বুঝতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। এর উদ্দেশ্য শুধু মাত্র মস্তিষ্কের বিকাশ সাধন নয়,

হৃদয়ের বিকাশ সাধনও বটে। পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয় 'সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বিকাশ'। মানুষের সমগ্র সত্তার বিকাশের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। কিন্তু 'মানুষের সমগ্র সত্তার বিকাশ' এই কথার তাৎপর্য খুব সহজ নয়। দেশ ও কাল ভেদে এর অর্থ বিভিন্ন হওয়াই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয় বোধের যোগ।"

"গীতা বলছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যেবুদ্ধে পরতস্তু সঃ।

"ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হইয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

"ইন্দ্রিয় সকল কেন শ্রেষ্ঠ?—না ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ সাধন হয়। কিন্তু, সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ। কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু, জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যেই তাঁকে উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

"এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

"অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবে ইহা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কল-কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-

কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়। আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।"

(শিক্ষা—পৃঃ ১২৪)

Friedrich Frobel (1782-1852) এই বিষয়টিকেই অন্যভাবে বলেছেন,—

"The proper destiny and Vocation of Man, as a being endowed with understanding and reason, is to bring to clear consciousness his nature, that is, the Divine in him, to exercise self-determination and freedom thus to make manifest in his own life, the Divine nature."

উপনিষদের যে বাণীটি কবিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে তা হচ্ছে—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত বলে জানবে।

অন্যত্র কবি বলছেন,—"যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলেছে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্যনিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে, গন্ধে, বর্ণে, ভাবে মানুষের চৈতন্যকে প্রতিনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে, ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে।"

(শিক্ষা—পৃঃ ১২০)

"সমস্ত সৃষ্টির মাঝে সেই পরম একের পরম প্রকাশ। সর্বত্রই তার লীলা। তাই অন্যত্র বলছেন,—'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—' এই যা কিছু সমস্তই পরম প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে।" (শিক্ষা—পৃঃ ১০১)

এইরূপ একটি বাণী আমরা পেয়েছি Friedrich Frobel-এর শিক্ষা-দর্শন থেকে। তাঁর Education of Man গ্রন্থে তিনি বলছেন,—

"Nature and all existence are a manifestation, a revelation of god *raisondetre* of all existence to reveal God. Everything is divine by nature ; its essence is divine. Everything is relatively a Unity. Since God is Unity complete and perfect in itself. ... From every point, from every object of nature and from every form of life there is a Way to God."

উপরের আলোচনা রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করবার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে বোধের শিক্ষাকেও স্থান দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, আমরা মানুষ বলতে যা বুঝি আমাদের শিক্ষা প্রণালীও তদনুরূপ আদর্শ সম্পন্ন হবে। কারণ মানুষ করে তোলাই শিক্ষা।—(ধর্ম—পৃঃ ১২৯) কিন্তু মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মানুষের সমগ্র সত্তার বিকাশের সঙ্গে এর যোগ আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে অন্যের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য আছে। "ফুল যখন ফুটছে তখন সে এমনি করে ফুটছে যেন সেই চরম, তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই।" (শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড—পৃঃ ১১৬) তাই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব লাভ সহজ, কিন্তু মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ সহজ নয়। তার কারণ মানুষ ক্ষুদ্র নয়। মানুষের মর্যাদার কোন শেষ নেই, ব্রহ্মের মধ্যেই তার সমাপ্তি। (ধর্ম—পৃঃ ১৩৫)

মানুষের নিকট বিশ্বপ্রকৃতির একটি আহ্বান আছে—সেটি হচ্ছে মনুষ্যত্ব লাভের আহ্বান। সেটি হচ্ছে—উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! উত্থান করো, জাগ্রত হও—এই মন্ত্রের আহ্বান। কবি এই আহ্বানকে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন—"নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো; এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখ দুঃখের বিচিত্র

সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো।" (ধর্ম—পৃঃ ২২)

কিন্তু মানুষের পক্ষে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া আদৌ সহজ নয়। নদীর মতো নানা বাধা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে মানুষকে প্রবাহিত হতে হয়। প্রতি মুহূর্তেই তাকে জাগ্রত থেকে এই মনুষ্যত্ব লাভের সাধনা করতে হয়। তাই কবি বলছেন,—"এই জন্য পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে।" (ধর্ম—পৃঃ ২৫)

"অতএব প্রভাতে যখন বনে উপবনে পুষ্প পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা, তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ, আপন দুঃসহ দুঃখ, আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখির গান এবং ছায়া লোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রাম ক্ষেত্র—সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয় চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। সুখ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ মানুষ মহৎ, কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন এবং মানুষের যে পথ 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।" (ধর্ম—পৃঃ ২৫)

আমরা যদি মনুষ্যত্বলাভই মানবজীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে চাই, তবে আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যও তদনুরূপ হওয়া চাই। খুব বড়ো করে যদি আমরা জীবনকে দেখতে পাই—তবে লক্ষ্যকেও আমাদের অনেক দূরে স্থাপন করতে হবে এবং সেই অনুসারে সাধনা করতে হবে। কবির কথায়—"জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং

বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবতই মনে আসে না।" (শিক্ষা—পৃঃ ১৭১)

এই মনুষ্যত্বলাভ সহজসাধ্য নয়, সাধনার দ্বারা দুঃখের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বলাভের সাধনা করতে হয়। এবং আমাদের বিদ্যালয়েও এই সাধনার যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। বিদ্যালয়ে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করবারও একটা সুযোগ থাকা চাই।

বিদ্যালয়ে মানুষ প্রথমে আপনার সামগ্রিক বিকাশের সাধনার মধ্য দিয়ে এই মনুষ্যত্বলাভের উপযুক্ত হতে পারে। এই বড়ো হবার সাধনার দ্বারা আমরা আমাদের লক্ষ্যের অনুবর্তী হতে পারি যদি কোথায়ও আমাদের মানসিক বিকাশ বাধা না পায়, আমাদের জীবনে যদি সুস্পষ্টতা থাকে। আমাদের হৃদয় যদি আশার দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে, তবেই আমাদের সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারে।

তাই কবি বলছেন,—"আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড় হইয়া ওঠে। ··· কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সকলের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তা নহে ; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই, প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে।" (শিক্ষা—পৃঃ ১৭০)

রবীন্দ্রনাথের মতে—শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে আমাদের হৃদয়ে এই অনন্ত আশার উদ্বোধন। "তুমি কেরাণীর চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনক্রমে ইস্কুল মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সন-ভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে—এ মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশের সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। ··· এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে

একথা আমাদিগকে বোঝায় না। আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।” (শিক্ষা—পৃঃ ১৭২)

কবি যে শিক্ষার লক্ষ্যের কথা বলেছেন—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদদের লেখায় তার তেমন মিল দেখি না। কিন্তু এর আভাস পাই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-বিষয়ক কথাগুলিতে। স্বামীজী বলেছেন—“ইউরোপের বহু নগর পরিভ্রমণ কালে উক্ত দেশের গরীব লোকদের জন্যও শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা দেখিয়া স্বদেশে দরিদ্রগণের দুরবস্থার কথা আমার মনে পড়িত, এবং আমি অশ্রু-বিসর্জন করিতাম। কিসে এই পার্থক্য হইল ? উত্তর পাইলাম—শিক্ষাই উক্ত পার্থক্যের মূলে। সুশিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সুপ্তব্রহ্ম জাগ্রত হয়।”

বিবেকানন্দ আরও বলেছেন—“পরাধীন আইরিশরা স্বদেশে উপেক্ষার আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত থাকিত। তথায় সমগ্র প্রকৃতি একবাক্যে বলিত, ‘প্যাট্, তোমার কোন আশা নাই। তুমি আজন্ম গোলাম, এবং মৃত্যু পর্যন্ত তুমি গোলামই থাকবে।’ জন্মকাল হইতেই এই কথা তাহার কর্ণগোচর হইত বলিয়াই প্যাট্ এই বাক্যে বিশ্বাস করিত এবং ‘সে যে সত্যই হীন’—এই ভাব তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইত। কিন্তু আমেরিকাতে পদার্পণ করিয়া সে চারিদিক হইতে শুনিল,—‘প্যাট্, আমরা যেমন মানুষ তুমিও সেইরূপ মানুষ, মানুষই এই সব করেছে। আমার মত, তোমার মত মানুষই সব করতে পারে। সাহস অবলম্বন কর।’ প্যাট্ তাহার অবনত মস্তক তুলিয়া স্বচক্ষে দেখিল—ইহা সত্যই। প্রকৃতি স্বয়ং যেন তাহাকে বলিতে লাগিল—‘ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যবস্তু লাভ না হওয়া পর্যন্ত থামিও না’।”

‘আশা’ও ‘আত্মচেষ্টা’ এই দুইএর সাহায্যে নিজেকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হয়। তবেই মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। “মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনও অসাধ্য হতে পারে না।” প্রকৃত শিক্ষা ‘দুর্জয় প্রাণ-চেষ্টার’ উদ্বোধন করে মানুষকে

অসাধ্য-সাধনে সচেষ্ট করে। কিন্তু মানুষের এই যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা সেটি যেন হৃদয়ের আনন্দের দ্বারা উৎসাহিত হয় এবং তা তখনই সম্ভব যখন আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষের ধর্মবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ, 'ধর্মবোধের জাগরণের মত এতবড়ো জাগরণ জগতে আর কিছুই নাই; ইহা মূককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়।' ...আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতেপারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে,—ইহার কোনো অর্থ নাই।" (শিক্ষা—পৃঃ ১৭৭)

কিন্তু মানুষের জীবনে কোন কিছু আশা করবার জন্য একটি প্রবল 'ইচ্ছা' থাকা প্রয়োজন। 'ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা।' শিক্ষার আর একটা উদ্দেশ্য—এই ইচ্ছা শক্তিকে জাগ্রত করা। সুদৃঢ় ইচ্ছাই প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করে—মানুষকে গৌরবের পথে চালিত করে। আবার জাতীয় গৌরববোধ এবং ধর্মবোধ দৃঢ় ইচ্ছার সৃষ্টি করে। ম্যাকডুগালের মতে—"Will always involves the activity of the self-regarding sentiment."

কি প্রকারের শিক্ষা গৌরববোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি করতে পারে? এই সুশিক্ষার বৈশিষ্ট্য কি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহা সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল।" (শিক্ষা—পৃঃ ৭৮)

আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি ভাবে এই গৌরববোধের, এই দৃঢ় ইচ্ছা সৃষ্টির শিক্ষা দিতে পারি? ডাঃ মন্তেসরীর মতে শিশুকে প্রথম থেকেই স্বাধীন ভাবে কাজ করবার সুযোগ প্রদান করলে এই ইচ্ছাশক্তির জন্ম হতে পারে।[১] শিক্ষাকে যদি আমরা শিশুর

১। "It should be clear that there can be no 'fraining of the Will' apart from the general process by which the senti-

জীবনযাত্রার অংশ হিসাবে দেখি, শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে আমরা যদি উৎসাহিত করি, তবেই শিশুর মনে আত্মবোধসম্পন্ন বিশেষ রসের (Sentiment) সৃষ্টি হতে পারে।

সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের মাঝে প্রবল ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি করা, মানুষকে লক্ষ্য সাধনে নির্ভীক করা। উপনিষদের একটি মন্ত্র হচ্ছে 'অভীঃ', অর্থাৎ নির্ভীক হও, ভয় করো না। স্বামী বিবেকানন্দ বড় জোরের সঙ্গে এই কথাটি দেশবাসীকে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই বাণীটি অন্য ভাবে আমাদের শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষিত মানুষকে বলতে হবে 'আমার অন্তরে সম্পদ আছে', 'সে যেন বলতে পারে আমি সব পারি, সব পারব।' কবি বলছেন—"আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে,—'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করবার অন্ত নেই। সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেই জন্য বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈব কর্তৃক প্রবঞ্চিত।" (শিক্ষা—পৃঃ ৩০২)

বলিষ্ঠ, দৃঢ় ইচ্ছা-সম্পন্ন মানুষ তৈরি করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। "আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষা-সাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।"··· "সকল অবস্থার জন্য নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধন করায়; অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্য চর্চায় নয়, পৌরুষ চর্চায়, চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মঠ করায়—শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।"

---

ments are built up. Hence Montessori is right in maintaining that to train a child's will we must begin by leaving him free to work out of his own impulses"—(Nunn's *Education and its Data etc.*—Page 217)

আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য এই যে, শিক্ষার্থীকে কৃতিত্ব অর্জনে সহায়তা করা। এই ব্যবহারিক কৃতিত্ব যাকে ইংরাজিতে আমরা skill বলি, সেটি মানুষের সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের জীবনে আর একটি বিশেষ জিনিসের প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে সংস্কৃতি বা Culture. এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামত এইরূপ,—"এই কৃতিত্ব শিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই যে যথেষ্ট নয়, এ কথা মানতে হবে।··· আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থ ভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে।"

সুতরাং সংস্কৃতিবান মানুষ সৃষ্টি—সুশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। যে শিক্ষাব্যবস্থা এইটি পারে না, তাকে সুশিক্ষা বলা সম্ভব নয়।

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন প্রবৃত্তি জাগ্রত করা। প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানুষ নিজেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে না। বৈষয়িক সুখ যে সহজেই লভ্য নয় একথা আজ য়ুরোপের মানুষ প্রমাণ করেছে। ভারতবর্ষকে যদি সমাজ-জীবনের নানা কুসংস্কার অতিক্রম করে সুস্থ সবল জীবন প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতে হয়, তা হলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রসার হলেই তবে মানুষের আশা বড়ো হতে পারে এবং আত্মশক্তি জাগ্রত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,—"বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্ব-নিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এই জন্যে, এই নিয়মের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যে নিহিত,—এ কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি।

বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না।" (শিক্ষা—পৃঃ ২৪৬)

সুতরাং যাঁরা বলেন আমরা ধর্ম মানি সুতরাং বিজ্ঞানকে মানি না, বিদ্যার সঞ্জীবনী শক্তিটা চিরকাল তাদের নাগালের বাইরে থাকবে এবং বস্তুজগতের ওপর যারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না,—তাদের আত্মশক্তি বিকাশের সম্ভাবনাও কম।

কিন্তু বিজ্ঞান যে 'প্রকৃত ধর্ম'-এর বিরুদ্ধে নয় তা রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ভাবেই আলোচনা করেছেন।[২] তাঁর নিম্নলিখিত মতামতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। এই জন্যই আমাদের উপনিষদ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন — "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" অর্থাৎ, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে

২। বিজ্ঞান যে ধর্মের বিরুদ্ধে নয় এই কথাটি অন্যভাবে বলেছেন Herbert Spencer—"The discipline of science is superior to that of our ordinary education, because of the religious culture that it gives." (*Education* : Page 47)

অথবা

"True science and true religion", says Professor Huxley, "are twin sisters and the separation of either from the other is sure to prove the death of both. Science prospers exactly in proportion as it is religious ; and religion flourishes in exact proportion to the scientific depth and firmness of its basis. The great deeds of philosophers have been less the fruit of their intellect than of the direction of that intellect by an eminently religious tone of mind. Truth has yielded herself rather to their patience, their love, their single-heartedness and their self-denial than to their logical acumen." (*Education* : Page 47)

বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বতকালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্য পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত। ···তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য-চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুই-এর যোগে তুমি বড়ো হও। জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে, অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।" (শিক্ষা—পৃঃ ২৪৪)

বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা বিশ্বের নিয়ম আবিষ্কার করতে পারি এবং তার সাহায্যে বস্তুজগতের উপর আমরা আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিজ্ঞানের বিদ্যাটাকে বলেছেন—'আধিভৌতিক রাজ্যের বিদ্যা'। এ বিদ্যা 'সঞ্জীবনী বিদ্যা'। এর সাহায্যে জীবন রক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে ; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয় ; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। "এই বিদ্যা যথাযথ বিধির বিদ্যা, এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়া পত্তন হবে—অন্য উপায় নেই।" (শিক্ষা—পৃঃ ২৪৫)

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য হবে ব্যবহারিক সুযোগ লাভ এবং উচ্চতর লক্ষ্য হবে মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মনের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের পূর্ণতা সাধন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অর্থনৈতিক দিকটা অবেহেলা না করলেও মনের বিকাশের দিকটার উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তিনি নানাস্থানে

উল্লেখ করেছেন—পিতামাতার উচিত 'গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে' পাকা করে তার পরে আবশ্যক মতে ছেলেকে, ধনীর সন্তান করে তোলা (শিক্ষা—পৃঃ ৬১)। কিন্তু এই সাধারণ 'মনুষ্যত্বের মূল সূত্রটি' কি? অর্থাৎ মনের বিকাশের প্রকৃত অর্থ কি? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনের দাসত্ব মোচন করা' (বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৪)। মনের দাসত্ব ঘুচাতে না পারলে, শিক্ষা মানুষকে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারে না। মনের এই শক্তি অর্জনই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। কারণ একমাত্র শক্তিমানেরাই জীবন ভোগ করতে পারে। কিন্তু এই ভোগের অর্থ এই নয় যে, প্রতিনিয়ত ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি বাড়াতে হবে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এই যে, ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি নয়, বস্তুকে জয় করে, মনকে উপকরণের উর্ধ্বে স্থাপন করে মনকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হবে। কবি এই বিষয়টি তাঁর 'তপোবন' শীর্ষক প্রবন্ধে বড়ই সুন্দর করে বলেছেন: "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে। ··· ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ নানা প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।" (শিক্ষা—পৃঃ ১১০) "ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি (তপোবন—পৃঃ ১১১)। আবার অন্যত্র বলেছেন—"ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকে লাভ করে তখনি সে অমৃত লাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে,—নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে।" (শিক্ষা—পৃঃ ৭৯)

ত। পাশ্চাত্যের

এই গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই মানুষ ত্যের সঙ্গে মিলিয়ে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারে। "তার বষয়িক ও ব্যবহারিক গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই প্রাণের শষভাবে উপলব্ধি করা

কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই ছুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের,—আমাদের প্রাণের, আমাদের বুদ্ধির, আমাদের সৌন্দর্য-বোধের, আমাদের মঙ্গল প্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূলধর্মই এই যে সে কেবলমাত্র দেবে তা নয় সে ত্যাগও করবে।”

(শান্তিনিকেতন—পৃঃ ১৬)

মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসার্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা—তার ছুটো দিক আছে। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর একটা সামাজিক সামঞ্জস্যতা। এই ছুটো পরস্পর যুক্ত, এদের মাঝে কোন ভেদ নেই। সমাজের মধ্যে না থাকলে আমরা আমাদের সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে পারি না। “মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন, তাঁদের শক্তি সকলের ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়।”[৩] সুতরাং শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য মানুষকে আপন সমাজের যোগ্য করা। শুধু জীবন ধারণের যোগ্যতা অর্জন নয়, শুধু ব্যক্তির সম্পূর্ণ বৃদ্ধি নয়। উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে “বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠ”[৪] করার দিকে মানুষকে পরিচালিত করে।

সুতরাং শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক বোধের উন্মেষ। আধুনিক শিক্ষাবিদদের[৫] মতে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ছাড়া ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সমাজেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিশতে পারি, পরস্পরকে বুঝতে পারি এবং সেই অনুসারে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। “পরস্পরের

৩। রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ১২৯।

৪। ...খেঐ

লাভ এবং উচ্চতর Nunn-এর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :—

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে velops only in a social atmosphere where mon interests and common activities......

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার 'vidual when alone.”

বিকাশের দিকটার উপ (*Education and its Data etc.* : P. 16)

মধ্যে পরস্পরের আত্মোপলব্ধি যতই সত্য হতে থাকে ততই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট হয়।"

কিন্তু সামাজিক জীবনের যোগ্য হওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য, এটি রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেন নি। মানুষের সামাজিক জীবনের তাৎপর্য তিনি অন্যভাবে দেখেছেন। তাই তিনি বলছেন,—"ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে,—সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।" (ধর্ম পৃঃ ১৩৯) উপনিষদের যে বাণীটি বিশেষভাবে ভারতের চিত্তকে পরিচালিত করেছে কবির মতে তা হচ্ছে—"'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত কিছুই আচ্ছন্ন জানিবে।"

সুতরাং আমরা যদি সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলে জানতে পারি, তাহা হলে সংসারের বন্ধন আমাদের আটকে ধরে না, আমাদের বিকাশে ব্যাঘাত ঘটায় না।

"সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া বড় করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন নির্বাহের গোড়াকার কথা। ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।" (ধর্ম—পৃঃ ১৪০)

রবীন্দ্র-শিক্ষার লক্ষ্য যে তাঁর জীবন-দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে—এটি আমরা উপরের আলোচনা থেকে বোধ হয় লক্ষ্য করতে পেরেছি। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য-নির্দেশের মধ্যে দুটি বিষয়ের প্রভাব আমরা দেখতে পাই। শিক্ষার চিরন্তন লক্ষ্য-নির্ণয়ে কবি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেও, অন্য দিকে তাঁর বক্তব্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কবি ভারতের চিরন্তন সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। এই যে তাঁর চিন্তার মধ্যে একটি বৈষয়িক ও ব্যবহারিক চিন্তার প্রভাব—এটিই আজ আমাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করা

প্রয়োজন। এই ভাবে চিন্তা করলে রবীন্দ্র-শিক্ষার লক্ষ্যের প্রধান বিষয়গুলি এইভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি :

(১) শিক্ষার্থীর সমগ্র সত্তার বিকাশ,

(২) জীবনের একটি মহৎ আদর্শ স্থির করা এবং শিক্ষার্থীর জীবনে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আশা ও সাহস সৃষ্টি করা,

(৩) আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় ইচ্ছা জাগ্রত করা,

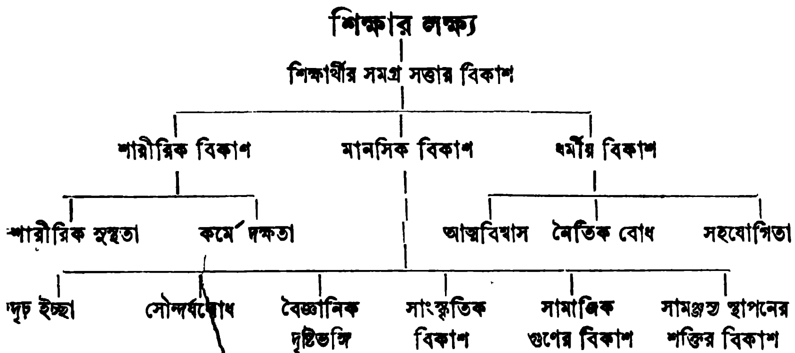
(৪) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা,—যার সাহায্যে শিক্ষার্থী সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনে নিরলস চেষ্টা করতে পারে,

(৫) শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয় মনোভাব এবং সংস্কৃতিবোধ জাগানো,

(৬) শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণের বিকাশ সাধন করা।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির পূর্ণবিকাশের কথা বলেছেন—যে ব্যক্তি সংস্কৃতি-সম্পন্ন, ধর্মবোধে উদ্দীপ্ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং জীবনের মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দৃঢ় ইচ্ছাসম্পন্ন এবং যে অনন্ত আশা ও সাহস নিয়ে সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনে উৎসাহী এবং যার কর্ম ও ব্যবহার সামাজিক মঙ্গলের অনুবর্তী।

নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে আরও বিশদভাবে রবীন্দ্র-শিক্ষার লক্ষ্যটি প্রকাশ করা যেতে পারে,—



রবীন্দ্র শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সমগ্র সত্তার বিকাশ। এই সমগ্র সত্তার বর্ণনা ইংরাজী Personality অথবা Individuality-র দ্বারা সম্ভব নয়। কেউ কেউ প্রথমটাকে 'ব্যক্তিত্ব' এবং দ্বিতীয়টিকে 'ব্যক্তিতা' বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্র সত্তার কথা বলেছেন

—তা ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিতা নয়। একে আমরা 'মনুষ্যত্ব'-এর বিকাশ হিসাবে ধরতে পারি। কিন্তু মনুষ্যত্ব তো ব্যক্তিত্বের চেয়েও বেশী। মনুষ্যত্ব সম্পর্কে 'চলন্তিকায়' রাজশেখর বসু মহাশয় বলেছেন—'মানবতা বা মানবোচিত সদ্গুণ'।

এই মনুষ্যত্বের বিকাশ কি ভাবে শিক্ষার সাহায্যে ঘটানো সম্ভব? এর প্রকৃত উত্তরের জন্য আমাদের আরও আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু একটা বিশেষ প্রশ্নের আলোচনা এখানে আমরা তুলতে পারি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব কতখানি কার্যকরী? আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে এদের প্রভাব যথেষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্র শিক্ষা-চিন্তায় এই বিষয়-গুলির আলোচনা তেমন দেখি না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পরিবেশের প্রভাবের কথা বিশেষ করে আলোচনা করেছেন। তবে সেটি বর্তমানের সামাজিক পরিবেশ নয়, সেটি হচ্ছে প্রাচীন কালের তপোবনের পরিবেশ যা তিনি শান্তিনিকেতনে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন,—"মানুষকে বেষ্টন করে এই-যে জগৎ-প্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোন মতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে।" (শিক্ষা—পৃঃ ১০৫)

রুশোও সমাজকে কলুষিত মনে করে শিক্ষার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজকে ঠিক ঐ ভাবে তাচ্ছিল্য করেন নি। তবে শিক্ষার সমস্ত দিক বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে যে অনন্যসাধারণ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন—তা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেছেন এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশকে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করেছেন। এই পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্য—চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির

মাঝে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত পরমপুরুষকে জ্ঞাত হওয়া। কারণ "যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—এই যা কিছু সমস্তই পরম প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে।[৬]

শিক্ষার ভিত্ত

প্রত্যেক দেশের জাতীয় শিক্ষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, একটি বিশেষ ধর্ম আছে। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ তার আপন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে যদি তার প্রতিষ্ঠা হয় জাতীয় ভিত্তির উপর। বিশাল বনস্পতির লক্ষ্য হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশে তার শাখা-প্রশাখা মেলে দিয়ে তার সবুজ পত্রে আলোছায়ার লীলা অনুভব করবে, আশ্রয় হবে পক্ষীকুলের এবং আপন বিরাটত্বের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বিরাট মহিমা ঘোষণা করবে। এই জন্য বনস্পতির প্রথম প্রয়োজন সরস ভূমি এবং আপন মূলের সাহায্যে ভূমির গভীরতা থেকে

৬। (ক) Sir P. Nunn তাঁর *Education, its Data and First Principles*-এ (পৃঃ ১৭) -এ বিষয়টি R. Bridges-এর একটি কবিতা উদ্ধৃত করে প্রকাশ করেছেন :

"......The high goal of our great endeavour
is spiritual attainment, individual worth,
at all costs to be sought and at all cost pursued,
to be won at all cost and at all cost assured."

(খ) J. S. Ross তাঁর *Ground Work of Educational Theory* নামক পুস্তকে (পৃঃ ১২৩) Eucken-এর *Life's Basis and Life's Ideal* থেকে দেখিয়েছেন :

"The end of life is to acquire an inner relation to infinity, to get into harmony with the soul of the universe by finding and contemplating the Good : the function of education is to help us in our exploration of the ultimate, universal values, so that the truth of the universe may become our truth and give power to our life."

প্রতিনিয়ত জীবন-রস সংগ্রহ করে সর্বদেহে সঞ্চালিত করা। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাও জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে দেশের চিত্ত থেকে আপন জীবন-রস সংগ্রহ করে এবং সর্বদেহে সঞ্চারিত কোরে জাতির চিত্তকে প্রস্ফুটিত করে। শিক্ষাব্যবস্থার এই ভিত্তিমূল শিথিল হলে, তার সাহায্যে মানুষ আপন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা যে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করতে পারছে না, তার কারণ দেশের মাটির সঙ্গে এর সংযোগ খুব ক্ষীণ। এই কারণে এর সাহায্যে আমাদের মন ভরছে না, চিত্ত প্রস্ফুটিত হচ্ছে না। এ যেন টবের গাছের মত একটি ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মেছে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষার দুর্বলতা এখানেই। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়নি। এ একান্তভাবে বাইরের জিনিস। আমাদের অন্তরের জিনিস নয়। "ভাণ্ডার ঘর যেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমন করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহার্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ··· যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহারই সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।" (শিক্ষা—পৃঃ ২২৯)

শিক্ষা যদি অমৃতের উপকরণ না হয়, তা হলে তা আমাদের মনুষ্যত্বের লক্ষ্যে চালিত করতে পারে না। আজ আমরা বিলাতী মার্কা-মারা যে বিদ্যা লাভ করছি—এটি বই-এর বিদ্যা ছাড়া কিছুই নয়। 'জীবনের অভিজ্ঞতা'র সঙ্গে বিদ্যার মিলন না হলে তার প্রকৃত মূল্য আমরা অনুভব করতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। "এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে 'রিভার' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনদিন সে কোনো রিভার

দেখিয়াছে কি না, তখন গঙ্গা-যমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, 'না আমি দেখি নাই'। অর্থাৎ এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয়; তাহা বহু দূরবর্তী, তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত।" (শিক্ষা—পৃঃ ২৩৩)

এর কারণ এই যে নূতন জ্ঞান বালকের আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় নি, পুঁথির বিষয় হয়ে রয়েছে। আমাদের বর্তমানের বিদ্যা পরের কাছে ধার করা। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মাঝে আমাদের নিজেদের দেশের বিদ্যার স্থান নেই।

আমাদের দেশের জাতীয় বিদ্যার স্বরূপটি বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন। কারণ সেটাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ক্রমবিকাশের নীতিতে বিশ্বাসী। শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ নির্দিষ্ট রূপের তিনি বিরোধী। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি স্থাণুনীতি (Static)-এর সমর্থক ন'ন। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে জন ডিউই-এর অনেক মিল আছে। যদিও পার্থক্যও আছে যথেষ্ট। সংস্কৃতি, নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ডিউই-এর মতবাদকে বলা হয়েছে 'Biological interpretation of human experience'.[১] রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের ইতিহাস যেমন ক্রমবিবর্তনবাদের অধীন, তেমনি জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিও অনুরূপ বিবর্তনের অনুবর্তী। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে যেমন মানুষের মনের পরিবর্তন হয়, তেমনি পরিবর্তিত হয় তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যেরও। জীবনবিকাশের নিয়ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ডিউই-এর মত অনুযায়ী 'Normal development of a life process'-এর এটি একটি অংশ।

১। "The question fundamentally at issue is nothing more or less than whether moral values, regulations, principles and objects form a separate and independent domain or whether they are part and parcel of a normal development of a life process." (Dewey : *Human Nature and Conduct*—Page 185)

ভারতীয় সংস্কৃতিকে যারা অপরিবর্তনীয় ও কোন নিয়মের অধীন নয় বলে বর্ণনা করতে ভালবাসেন রবীন্দ্রনাথ তাদের কঠোর ভাবে আক্রমণ করেছেন। "আমরা বলি যে পৃথিবীতে আর সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর সকল দেশের বিদ্যা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশ বিবর্জিত হইয়া অনন্তকালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। ··· স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই।"

তা হলে ভারতীয় বিদ্যার ক্রমবিকাশের প্রকৃত ধারাটি কি? তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কোন স্থানে বিধাতা আমাদের স্থাপন করেছেন? আমাদের প্রকৃত স্থানটি কি ভাবে আমরা চিনতে পারি? রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটি জানতে হলে "ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-প্রশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।"

"বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারত-চিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু, দেশে যে নদী চলিতেছে, কেবল সেই দেশের জলে

সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে।...

"অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিক ভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।" (শিক্ষা—পৃঃ ২৩৭)

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বিদ্যা ও সংস্কৃতির একটি ক্রমবর্ধমান রূপের কল্পনা করেছেন। ভারতবর্ষের সাগর তীরে ইতিহাসের যে সমস্ত জাতির পদচিহ্ন পড়েছে, তারা ভারতীয় চিন্তা, দর্শন ও সংস্কৃতিকে কমবেশী প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাবের কথা অস্বীকার করলে আমরা ইতিহাসের মূল শিক্ষাকেই অস্বীকার করব। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক ক্রমপরিবর্তনের এই রূপটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে আমাদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—"আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে।"

(বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৭)

নানা কারণে আমাদের পক্ষে ভারতীয় বিদ্যার এই সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যাকে আমরা ভেঙে ভেঙে আলাদা করে দেখেছি। আমাদের সমাজ-জীবনে আমরা যেমন জাতিভেদ স্বীকার করেছি,—তেমনি বিদ্যার ক্ষেত্রেও আমরা বিচ্ছেদের পথ অনুসরণ করেছি। বিদ্যার ক্ষেত্রে এই অনৈক্য আমাদের বুদ্ধির সহায়তা করেনি।

"ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিকে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক চেতনা-সূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। ···

"ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে ; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।" (বিশ্বভারতী—পৃঃ ৮)

আমাদের বর্তমান শিক্ষা যে নিষ্ফল হয়েছে তার প্রধান কারণ এই যে, তার ভিত্তি ভারতের স্বধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ শিক্ষা জাতীয়তা বোধের দ্বারা আবৃত নয়। এ শিক্ষা একান্তভাবেই বিদেশী এবং সংকীর্ণ স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের জাতীয় চিত্তের সঙ্গে এই শিক্ষার কোন যোগ নেই, এ ফরমাস দিয়ে তৈরি করা বাইরের জিনিস। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ভারতবর্ষের বিদ্যাকে পুনরায় আপন গৌরবে আমাদের বিদ্যায়তনে প্রতিষ্ঠিত করা।

"ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্ব সমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তেরীয়

ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষা সাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয়নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।"

সুতরাং ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন করে জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই ভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার না করলে এর সাহায্যে আমাদের জীবনের পূর্ণতা সাধন সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার আলোচনা করেছেন। "বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ-লাভ, এবং উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাদের সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন।" (বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৩)

আমাদের বর্তমান বিদ্যায়তনগুলি আমাদের জীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারছে না কারণ এই শিক্ষা প্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা কিছু সমস্ত আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে—আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্বভাব জন্মায়।[২] (বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৬)

২। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করে গড়ে উঠেছে—এই যুক্তির সমর্থনে আমরা 'মেকলের মিনিট' থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি। এই অংশ থেকে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব কত যুক্তিযুক্ত। ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মেকলে এই মিনিট

আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়গুলি আমাদের জাতীয় জীবনের অভাব মিটাতে পারছে না, তবুও এদের আমরা বহন করছি, কারণ এগুলি আমাদের অন্নচিন্তার[৩] সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একটা দাসত্বের আবরণে এই বিদ্যালয়গুলি আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, এই জন্য এই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারছি না।

আমরা 'শিক্ষার লক্ষ্যে'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি,—যে শিক্ষা আমাদের মনে আশা সঞ্চার করতে পারে না, আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারে

প্রকাশ করেন এবং তৎকালীন গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ওটি সমর্থন করেন। এইভাবে ভারতবর্ষে বিদেশী শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

"I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic. But I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. ......I certainly never met with any orientalist who ventured to maintain that the Arabic and Sanskrit poetry could be compared to that of the great European nations. And when we pass from works of imagination to works in which facts are recorded and general principles investigated, the superiority of the Europeans becomes absolutely immeasurable. ...The oriental language is barren of useful knowledge and full of monstrous superstitions. Are we to teach false history, false astronomy, false medicine, because we found it in company with a false philosophy ?"

উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক উক্ত 'মিনিটে' নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখলেন :

I give my entire concurrence to the sentiments expressed in the Minute.

[*A Source Book of Modern Indian Education* : (14—29) Compiled by M. R. Paranjpe, 1938]

৩। ইংরাজী বিদ্যা যে আমাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র বিদ্যা এ কথা লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন ১৮৪৪ সালে। "In every possible case a preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have been educated in the institution thus established and especially to those who have distinguished themselves therein by more than ordinary degree of merit and attainment. [Lord Hardinge's Resolution, 10th October, 1844.—Page 67]

না, সে শিক্ষা আমাদের মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে না। এই একটিমাত্র কারণের জন্যই এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় নয়।

কিন্তু আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত রূপটির সন্ধান আমরা কোথায় পেতে পারি? আমাদের দেশের টোলে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাকে আমরা কোন মতেই জাতীয় শিক্ষা বলতে পারি না, কারণ টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই একই কারণে মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষাও গ্রহণযোগ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় বিদ্যার আধুনিক বিবর্তিত রূপটিই আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা মিটাতে পারে। এই বিদ্যা জাতীয় বিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যার সম্মিলিত রূপ।

জাতীয় বিদ্যার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যার মিলনের প্রকৃত রূপটি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট নয়। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আপন জাতীয় রূপটিকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জাতীয়বোধের গণ্ডীকে আরও প্রসারিত করতে হবে। তবে এই প্রসার আত্মবিলুপ্তির দ্বারা নয়। কারণ আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা কখনও জীবনে স্বার্থকতা লাভ করতে পারব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করতে পারলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে পারব—নিজেকে ধ্বংস করে অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমাদের পক্ষে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।[৪]

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গে বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি স্থাপন করা। এই সংগতি স্থাপন সম্ভব যদি স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে আমরা নিজেদের মুক্তিদান করতে পারি। অন্য দেশের যা মঙ্গলজনক তা আমরা সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং পরিবর্তে আমাদের মৌলিক চিন্তার অংশ নেবার জন্য বিশ্বমানবকে

৪। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ২২

নিমন্ত্রণ জানাব। বিদ্যার ক্ষেত্রে এই পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী নয়। "এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করবার জন্য এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা' তা' সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।

"গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হল। না, তার কারণ বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন। আর সেই তপস্যার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে দিয়েছে।"

বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্বকে দেওয়ার সত্যবস্তু ভারতের আছে—আজ ভারতকে এই কথা ঘোষণা করতে হবে এবং পশ্চিমের নিকট থেকে নূতন বিদ্যা ভারতকেও গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া নেওয়ার ভিতর দিয়েই ভারতে যে নূতন জাতীয়তাবোধ জাগবে তার উপর ভিত্তি করে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

এই বাইরের বিদ্যাকে গ্রহণ করা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বাইরের বিদ্যাকে আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই করে গ্রহণ করবার প্রয়োজন আছে। নইলে বাইরের বিদ্যা কোনদিনই আপনার হবে না। এই জন্য শিক্ষার সঙ্গে দেশের জীবনযাত্রার যোগ থাকা চাই। আমাদের আপন বিদ্যার সঙ্গে মিলিয়ে নূতন বিদ্যা গ্রহণ করলে এর যথার্থ মূল্য আমরা বুঝতে পারি। "সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্যশিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।" (বিশ্বভারতী—পৃঃ ৭)

৫। বিশ্বভারতী—পৃঃ ৬৯

শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে জাতীয়তা। দেশের বিদ্যালয়কে সমাজের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার সঙ্গে যোগ রেখে স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক দেশেই তার বিদ্যালয়সমূহ সমাজের অঙ্গ। প্রত্যেক দেশেই তার শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন যোগ আছে। কিন্তু আমাদের দেশেই এর ব্যতিক্রম। "আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরাণিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্র-সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এই শিক্ষার কোন স্পর্শ পৌঁছায় নাই। অন্য কোন শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই। তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্য-বিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্র-স্থান অধিকার করিবে।" (বিশ্বভারতী—পৃঃ—৯)

শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম। বিদ্যা যদি একান্তভাবে বিদেশী হয় এবং তা যদি আমরা পরের ভাষায় গ্রহণ করি, তা হলে সেটি আমাদের মনে অসংলগ্নভাবে অবস্থান করে। আমাদের লব্ধ বিদ্যা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে একটি সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান থাকে। আমাদের ভাব ও ভাষা পরস্পর মিলতে পারে না। "এই জন্য বিদ্যাটার প্রতি আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে।"

আমাদের শিক্ষার-সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধন হয় যদি মাতৃ-ভাষার সাহায্যে আমরা শিক্ষা প্রাপ্ত হই। মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান লাভ না করলে আমাদের চিন্তার রাজ্যে একটি অস্পষ্টতা থাকে এবং অস্পষ্ট চিন্তাধারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে

পারে না। ভাব ও জীবন যাত্রার সঙ্গে শিক্ষার মিল হলে তবেই আমাদের মানসিক বিকাশ পূর্ণ হতে পারে। "বাল্যকাল হইতে যদি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব শিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে। আমরা বেশ সহজ মানুষের মত হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।" (শিক্ষা—পৃঃ ১০)

রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে বিদ্যার গতিময় দিকটির উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন। শিক্ষার মধ্যে এই গতিময় রূপটির প্রকাশ হয় তার ক্রমবর্ধমান রূপের মধ্য দিয়ে। দেশের শিক্ষার সঙ্গে যদি নূতন বিদ্যার উদ্ভাবনার সুযোগ থাকে তবেই বিদ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে যেতে পারে। আজ আমাদের বিদ্যালয়ে যদি বিদ্যার্থীরা লব্ধ বিদ্যাকে চর্চার দ্বারা বৃদ্ধি ক'রে নূতন মৌলিক বিদ্যার উদ্ভাবন করতে পারেন—তবেই দেশের শিক্ষা সফল হয়েছে—এই কথা আমরা ধরে নিতে পারি। বিশ্বে কোন জাতির পরিচয় হয় তার মৌলিক চিন্তার দ্বারা। পূর্বে বিশ্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ 'মৌলিক চিন্তা' সৃষ্টির দ্বারা আপন মহত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ যদি আমরা আবার নূতন বিদ্যা উৎপাদন করতে না পারি, তা হলে নব নব আবিষ্কারের জন্য আমাদের পর-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। আজ যদি আমরা আমাদের বিদ্যাক্ষেত্রে নানা আলোচনা, নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়ে সত্য সন্ধানে নিযুক্ত হই, তা হলে জাতির যথার্থ বিদ্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ বিদ্যাই গতিশীল। বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে এই প্রণালীর সাহায্যে যে কেবল মাত্র নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তা নয়, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহও পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ যে কয়েকটি মূল জিনিসকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা সংক্ষেপে এইরূপ:

(১) ভারতের নিজস্ব চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে ভারতের আধুনিক

বিদ্যালাভের ক্ষেত্র স্থাপন করতে হবে। ভারতের মৌলিক চিন্তাধারা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরাজ সংস্কৃতির একটি মিশ্রিতরূপ—এই হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

(২) জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের আদান প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। জাতীয় জ্ঞান ধারা বিশ্ব-জ্ঞান ধারার সঙ্গে মিলিত ও পুষ্ট হয়ে জাতির চিত্ত বিকাশে সাহায্য করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে জৈবিক বিকাশের নিয়মে বিশ্বাসী।

(৩) জাতীয় বিদ্যালয়কে দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ বিদ্যালয়কে সামাজের অঙ্গ হিসাবে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক জীবনযাত্রার একটি সম্পূর্ণ যোগ স্থাপন করতে হবে।

(৪) শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মাতৃ-ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) লব্ধ বিদ্যাকে চর্চার দ্বারা বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হবে, এবং এই ভাবে নূতন জ্ঞানের সৃষ্টি করতে হবে।

শিশু-মনস্তত্ত্ব

শিশুমনের গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শিশু-শিক্ষার পথ নির্দেশ করা কঠিন। অন্যান্য শিক্ষাবিদদের মত রবীন্দ্রনাথও শিশুমনের স্বরূপ নিরূপণ করে তাঁর শিক্ষানীতি নির্ধারণ করেছেন। শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কবির জ্ঞান পরীক্ষামূলক না হলেও, একান্তভাবে আপনার অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

শিশুদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা,—"ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,—নন্দনের এনেছে সংবাদ।"[১] পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের

১। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অনুরূপ মন্তব্য—
"But trailing clouds of glory, do we come
From God who is our home :
Heaven lies about us in our infancy."

\

যোগসূত্র শিশুরাই স্থাপন করে। এই জন্য বোধ হয় যিশুখৃষ্ট শিশুদের বিশেষ করে শ্রদ্ধা করেছেন। 'কারণ, শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে।'

তাই কবি শিশুদের প্রতি আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছেন—

"ছোটো ছোটো হাসি মুখ জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারিধারে।

সোনার রবির আলো কত তার লাগে ভালো,
ভালো লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি, ধুলিরে জানে না ধুলি,
সবই তার আপনার ধন।

কোলে তুলে লও এরে এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে,
ইহাদের করো আশীর্বাদ॥" (শিশু—পৃঃ ১৯০)

শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার রূপ অনুযায়ী জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। রুশো, ডিউই প্রভৃতি সকলেই এইরূপ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে শিক্ষার্থীর জীবনকে কোন ভাগ করেন নি বটে তবে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের[২] ভিত্তিতে আমরা শিক্ষার্থীর জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন,—**শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন।**

শিক্ষাতত্ত্বের নীতি অনুযায়ী এইরূপ বিভাগ যুক্তিযুক্ত। প্রথম অবস্থায় শিশুর শিক্ষা হয় সাধারণতঃ গৃহে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং চতুর্থ অবস্থায় কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে।

২। "আমরা বাল্য হইতে কৈশোরে এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি ..." (শিক্ষা—পৃঃ ৯)

আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে জন্ম থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু। শিশুর জীবনের প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা তার মনকে নূতন জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে। এই জ্ঞানের যোগেই শিশুর মন পূর্ণ হয়, বিকশিত হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বিশ্বজগতের সঙ্গে শিশুর প্রথম যোগ স্থাপিত হয়।

প্রথম জীবনে শিশু দুর্বল এবং পরনির্ভর। জীবনের প্রথম দিকে তার একমাত্র নির্ভর মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহের উপর। স্নেহের আবরণে মা শিশুকে ঢেকে রাখেন। এই স্নেহ-পরিবেষ্টনের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের বস্তুর সঙ্গে শিশুর পরিচয় আরম্ভ হয়। শিক্ষাবিদগণ শিশুমনের এই পর্যায়কে বলেছেন—"বিস্ময়ের পর্যায়" (Wonder Stage)। হোয়াইট্‌হেড্ এই পর্যায়কে বলেছেন 'রোমান্স' বা আবেগের পর্যায়। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি অন্যভাবে বলেছেন ঃ

"নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে। নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে।" (শিক্ষা—পৃঃ ৮)

শিশুজীবনের এ এক বিশেষ অবস্থা। এই অবস্থায় মায়ের নিকট থেকেই তার প্রথম পাঠ শুরু। জন্মের পর শিশু মায়ের সঙ্গে বিযুক্ত হয়েও যুক্ত থাকে। মায়ের ভাবভঙ্গি, মায়ের কথা শিশুর মনে উদ্দীপনা জাগায়।

"মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কী আকুলতা,
তাকায় তাই বোবার মতো
মায়ের মুখচাঁদে।" (শিশু—পৃষ্ঠা ২৫)

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, শিশুর প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ তার পরবর্তী জীবনকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং

শিশুকে উপযুক্ত ও সুস্থ পরিবেশের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। শিশুর প্রথম জীবনে যদি ভাবের সমীরণ ও চিরানন্দলোক হতে আলোক এবং আশীর্বাদ ধারা নিপতিত হয়, তবেই তার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস ও পরিণত হতে পারে।[৩]

বিশ্বমানবের স্নেহের অন্তরালে বেড়ে ওঠে বলেই শিশু দুর্বল হয়েও সবল। শিশু যেমন মাকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠে, মাতৃহৃদয়ের তৃপ্তিও তেমনি শিশুজীবনের উপর নির্ভরশীল। মায়ের স্নেহ কেমন করে শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করে নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করে, কবি তা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। আমরা যখন কাউকে ভালবাসি, তখন যাকে ভালবাসা যায় তার চেয়ে নিজের লাভও কম হয় না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন—ভালবাসার দ্বারা আমরা আমাদের মনের প্রক্ষোভশীলতার তৃপ্তি সাধন করি। শিশুর বলা, শিশুর চলা, শিশুর রূপ মায়ের হৃদয়ে অজস্র আনন্দরসের যোগান দেয়।

মায়ের মনের ভাবটি কবি এই ভাবে প্রকাশ করেছেন :

"তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দস্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।"

শিশুজীবনের রহস্যের কোন কিনারা মা পান না। তাই তিনি বলেন—

"নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে।"

শিশু ক্ষুদ্র ও দুর্বল। কিন্তু মা মনে করেন তার শিশুর মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য ও রহস্য যেন ধরা পড়েছে।

"নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।"

৩। শিক্ষা—পৃঃ ৮।

"ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে—
নয়ন মাজনা।" (শিশু—পৃঃ ১৪)

শিশুকে শাসন করা সম্পর্কে মায়ের বক্তব্য নিশ্চয়ই আধুনিক শিক্ষাবিদগণের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য। অন্যের শাসন মায়ের পছন্দ হয় না। অন্যের দৃষ্টি দিয়ে খোকা ভাল কি মন্দ মা এ বিচার করেন না। "খোকা বলেই ভালবাসি—ভালো বলেই নয়।" প্রয়োজন বোধে মা তাকে শাসনও করেন। তবে খোকাকে কাঁদিয়ে তার নিজেকেও কাঁদতে হয়। তাই মা বলেন,—

"আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে।

তোমার শাসন আমরা মানিনেগো।
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যেগো।" (শিশু—পৃঃ ১৪)

শিশুর জীবনে যেমন স্নেহ দরকার, তেমনি দরকার শাসনের। কিন্তু যে সোহাগ করতে জানে না, ভালবাসতেও জানে না, তার পক্ষে শাসন করাও অনুচিত। সংসারে এইরূপ স্নেহের আবরণে শিশু আপনার বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া পায়।

শিশুর মনোবিকাশের প্রকৃত ধারাটি কিরূপ? মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, শৈশবে শিশুর চিন্তাধারা আত্মকেন্দ্রিক। শিশুর কল্পনা প্রকাশিত হয় আপনার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। শিশুর জীবনের নৈর্ব্যক্তিক কল্পনার স্থান গৌণ। তার সকল চিন্তাই আত্মমুখী। শিশুর জীবনের সঙ্গে যে সকল ব্যক্তি বা বস্তুর নৈকট্য রয়েছে—শিশুর মন তাদের নিয়েই স্বপ্নের মালা গাঁথে। এই হিসাবে শিশুর জীবনে মায়ের প্রভাব খুব বেশি।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। "বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের

গোড়াকার কথা"।[৪] শিশুজীবনের সাধনাও এই বিকাশের সাধনা। মনস্তাত্ত্বিকের মতে শিশুর জীবনে এই সাধনা কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। কৌতূহল প্রবৃত্তি (Instinct of Curiosity), অনুকরণ প্রবৃত্তি (Imitation) এবং কল্পনা বিলাস (Imagination) প্রভৃতি এর অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

এই সকল সহজ প্রবৃত্তির বশেই শিশু নানাপ্রকার মনগড়া খেলা আবিষ্কার করে এবং আত্মতৃপ্তি সাধনের জন্য ঐ খেলায় যোগ দেয়। শিশুর এই যে মনগড়া খেলা—এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এর একটি স্বতঃস্ফূর্ততা আছে। খেলার মাঠে মাষ্টার রেখে শেখাতে হয় না। এই খেলায় যোগ দিয়ে শিশু আনন্দ পায়। এই আনন্দই শিশুকে বুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

চক্ষু কর্ণ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে প্রাণীরা বহির্জগতের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক স্থাপন করে। এদের বলা হয় গ্রাহকযন্ত্র বা Receptors। মনোবিদগণ বলেন এই গ্রাহকযন্ত্রে কোন উদ্দীপক (Stimulus) যখন সাড়া জাগায় তখন সঙ্গে সঙ্গে তার অনুভূতিতেও সাড়া জাগে এবং তার মনে সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হয়। শিশুও এই ভাবে আপনার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপন করে। অনুভূতি যদি আনন্দদায়ক হয় শিশু সেই অনুভূতির আবির্ভাব পছন্দ করে এবং এর ফলে তার মন আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, শিশুও বিকশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আনন্দই সকল সৃষ্টির মূলে। শিশুর মনোবিকাশের মূলেও এই আনন্দের প্রভাব রয়েছে।

শিশুর জীবনে ইন্দ্রিয় সমূহ উপযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মনে কল্পনাবিলাসের খেলা আরম্ভ হয়। শিশু দেখে নানা লোকে নানা কাজ করে। মা বাবা, ভাইবোন শিশুর দৃষ্টির মধ্যে নানা কাজে লিপ্ত রয়েছে। শিশু যখন এই সমস্ত দেখে তখন সে তার কৌতূহল ও অনুকরণের প্রবৃত্তিবশে নিজের জীবনে এই কাজগুলি প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে। নূতন লোক ও কর্মের সংস্পর্শ

৪। বিশ্বভারতী—পৃঃ ৫৯

শিশুমনের উপর একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই শিশুর এই সমস্ত খেলার উৎপত্তি। মনোবিদগণ বলেন এইগুলি শিশুর আচরণের সার্থকরূপ,—এর মূলে সার্থক আত্মানুভূতি (Positive Self-feeling) রয়েছে।

অবশ্য এই সার্থক আত্মানুভূতি প্রথম থেকেই জন্মে না। শিশু যখন অন্যকে কাজ করতে দেখে তখন নিজে ঐ কাজ করবার সুযোগ না পেলে শিশুর মনে ব্যর্থ আত্মানুভূতির (Negative Self-feeling) সৃষ্টি হয়। নিজের অনুকরণ প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিশু আপনাকে ঐ কাজের সঙ্গে যুক্ত করে। কল্পনার সাহায্যে শিশু ঐ খেলা আরম্ভ করে। ব্যর্থ আত্মানুভূতিকে সার্থক স্তরে চালিত করবার জন্য এই খেলায় শিশুর সমস্ত মন যুক্ত হয় এবং ফলে শিশুর সকল প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধিত হয়। এই অবস্থায় শিশুর আত্মানুভূতি সার্থক স্তরে উন্নীত হয় এবং এই ধরণের খেলায় অংশ গ্রহণের ফলে শিশুর শরীর ও মন উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

স্যার পারসি নান এই ধরনের খেলা সমূহকে বলেছেন 'পরীক্ষা-মূলক আত্মগঠন' কর্ম (Experimental Self-building)।[৫] প্রকৃত গঠনমূলক কর্ম থেকে এর পার্থক্য আছে। এই ধরনের কাজের ফল অস্থায়ী। যতদিন শিশুর কল্পনা-বিলাসের বয়স থাকে, তার আত্মসাম্মুখ্য ভাবও (Self-assertion) নানা বিষয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং কোনটিই বিশেষ স্থায়ী আসন লাভ করে না। শিশুর এই খেলা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। পরবর্তীকালে কৈশোরের প্রারম্ভে এই কল্পনামূলক খেলার প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়। এই বয়সে শিশু যে সমস্ত কর্মের মাধ্যমে আপনার আত্মসাম্মুখ্য প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করে তা প্রধানতঃ প্রকৃত আত্মগঠনমূলক কর্ম (Serious Business of Self-building)।

সংক্ষেপে শিশুর মনোবিকাশের ধারা এইরূপ। রবীন্দ্রনাথ মানুষের চিন্তা বিকাশের রীতিকে দ্বান্দ্বিক মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা

৫। T. P. Nun's *Education—its Data and First Principle :* (Third Ed.) Page—182

করেছেন। বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার দ্বারাই মানুষ আপনাকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। 'আমাদের বিকাশ আমাদের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় চেষ্টার বিচিত্র ফল'।

এই মতবাদ শিশুর মনোবিকাশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যর্থ আত্মানুভূতিকে সার্থক স্তরে উন্নীত করার চেষ্টাই শিশুর সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই চেষ্টার শেষে পৌঁছানো কঠিন। একটি সার্থক স্তরে উন্নীত হলেই শিশুর চিন্তার রাজ্যে একটি পরিবর্তন ঘটে। শিশু তার উন্নততর চিন্তার সাহায্যে পরবর্তী উচ্চতর কর্মে আপনাকে নিযুক্ত দেখতে চায়। সুতরাং এখানেও শিশুর মনে দুটি অনুভূতির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। উন্নত স্তরে উঠবার জন্য শিশু পুনরায় নূতন কর্মের পুনরাবৃত্তি করে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সমস্ত প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন হয় ততক্ষণ তার খেলা চলে। এইভাবে শিশু নূতন উন্নততর কর্মের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। কর্ম থেকে কর্মান্তরে বিচরণের ফলে শিশুর শরীর ও মন নূতন নূতন কর্মানুযায়ী উন্নত হয় এবং এর ফলে শিশুর শরীর ও মনের বিকাশ সাধিত হয়।

শিশুমন বিকাশের যে সূত্র মনোবিদগণ আবিষ্কার করেছেন, শিশু-জীবন বর্ণনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের (Experimental Psychology) গবেষক ছিলেন না বটে, তবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই সত্যদ্রষ্টা ঋষির নিকট শিশুজীবনের রহস্য সহজভাবে ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে শিশুমনের নানাবিধ কল্পনার বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন শিশু কর্ম হতে কর্মান্তরে নিজেকে নিযুক্ত করবার জন্য ব্যগ্র। সংসারের সকল প্রকারের কর্মই তার অনুভূতিতে সাড়া জাগায়। কল্পনার সাহায্যে বিভিন্ন কর্মে সে অংশ গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র সাধ' কবিতায় শিশুর বিভিন্ন ইচ্ছার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন।

"আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই পাড়ার গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওয়ালা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
*　　*　　*　　*
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।" (শিশু—পৃঃ ৪২)

শিশু কল্পনায় কখনও ফেরিওয়ালা হচ্ছে, কখনও বা মালী, কখনও বা পাহারাওয়ালা। কিন্তু এই পাহারাওয়ালা বা মালী হয়েও শিশুর তৃপ্তি হচ্ছে না। নদীর ধারে গিয়ে যখন মাঝিকে দেখে নৌকা নিয়ে এপার ওপার করছে, তখন সে তার মনের সাধ মায়ের নিকট প্রকাশ করে বলে,—

"মা যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।" (শিশু—পৃঃ ৬৩)

জলের 'পর শিশুমনের একটা অদ্ভুত টান আছে। কখনও বা শিশু মাঝি হয়ে নদীর এপার ওপার করছে, কখনও বা মধুমাঝির নৌকাখানা নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চলে যাচ্ছে, কখনও বা 'কাগজের নৌকা' ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে,

"ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ নৌকাখানি।" (শিশু—পৃঃ ১৫৫)

শিশুর মনে বড় হবার ইচ্ছা খুব প্রবল। বড়দের মত কাজ করতে তার মন সব সময় উৎসুক। শিশু তার বড়ত্ব জাহির করে তার চেয়ে ছোটর সঙ্গে নিজের তুলনা করে। খুকির ছেলেমানুষী দেখে নিজের বিজ্ঞত্ব জাহির করে খোকা বলে :

"খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারী ছেলেমানুষ।"

কারণ, খুকি চাঁদকে ধরার যোগ্য মনে করে, গণেশকে গানুশ বলে, আর বিজ্ঞ খোকা যখন তাকে পড়তে বলে তখন সে 'দুহাত দিয়ে পাতা

ছিঁড়তে বসে।' খুকির চেয়ে বড় মনে করেই খোকার মনের তৃপ্তি হয় না। বড়দের কাজগুলি সে অনুকরণ করতে চায়। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে এই অনুকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নূতন নূতন কর্মের সঙ্গে নিজেকে পরিচয় ঘটিয়ে, নানাবিধ খেলার ভিতর দিয়ে বড়দের অনুকরণ করে, শিশু আত্মতৃপ্তি সাধন করে। তাই রাজমিস্ত্রিকে বাড়ি তৈরি করতে দেখে শিশু 'রাজমিস্ত্রি' হবার কল্পনা করে—

"বয়স আমার হবে তিরিশ
দেখতে আমায় ছোট,
সকাল থেকে সারা দুপর
ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর
খেয়াল মতো দেয়াল তুলি গড়ে।"

('রাজমিস্ত্রি'—শিশু ভোলানাথ—পৃঃ ৬৫)

বাড়িতে রোজ মাষ্টার মশায় পড়াতে আসেন। খোকারও ইচ্ছা হয় ঐ রকম 'মাষ্টার মশায়' হতে। কবি শিশুর মনের ভাষাটি এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন,—

"আমি আজ কানাই মাষ্টার,
পোড়ো মোর বেড়াল-ছানাটি।"

খোকা-মাষ্টার মশায়ের নিকট পড়বার জন্য উৎসুক, এরূপ কোন মানব-শিশুর কল্পনা শিশুর মনে আসে নি। শিশুর কল্পনায় সমস্তই সম্ভব। এই জন্য সে বেড়াল ছানাকেই তার পড়ুয়া হিসাবে গ্রহণ করেছে—তাতে তার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। শিশু তার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বেড়াল ছানার উপর দিয়ে করেছে। বেড়াল ছানা রোজ জোর করে পড়তে আসে, পড়তে বসে হাই তোলে, দিন রাত্রি খেলায় তার মন, "পড়ার বেলায় ভারী হেলা।" প্রথম ভাগের পাতা খুলে খোকা তাকে গোপালের মতো হতে বলে, চুরি করে খেতে বারণ করে, কিন্তু চড়াই পাখির দেখা পেলেই খোকার বেড়াল ছুটে ধরতে যায়, কোন উপদেশই তার মনে থাকে না। খোকার জীবনেও অনেক উপদেশ অনেকে দেয়, খোকা প্রয়োজনের সময় ভুলে যায়।

বড়দের মতো শক্ত কাজ করতে শিশু ভালবাসে। তাই কল্পনার সাহায্যে শিশু তার মনের তৃপ্তি সাধন করে। আমরা পূর্বেই বলেছি এই 'কল্পনা-বিলাস' শিশুমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে কল্পনায় আপনাকে বীর বলে মনে করে এবং কল্পনার সাহায্যে নানাবিধ বীরত্বের কাজ করে। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন—এইরূপ কল্পনার প্রয়োজন শিশুমনের 'আত্মবিস্তারের' জন্য। কারো কারো মতে এইরূপ কল্পনার মধ্য দিয়ে শিশু তার অপরিতৃপ্ত প্রভুত্ব-শক্তির তৃপ্তিসাধন করে।

রবীন্দ্রনাথ 'বীরপুরুষ' কবিতায় শিশুমনের এই প্রভুত্বকামী ভাবটি সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন।

"মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।"

উপকরণের 'পর শিশুর একটি অনাসক্তের ভাব আছে। "শিশু আচ্ছাদন ফেলিতে চায়, আমরা তাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই।"[৬]

তাই দেখি ধুলা মাটির 'পর শিশুর পক্ষপাতিত্ব। বয়স্কেরা এর অর্থ খুঁজে পান না। 'নির্লিপ্ত' কবিতায় কবি বলছেন,—

"বাছা রে মোর বাছা,
ধূলির 'পরে হরষ ভরে
লইয়া তৃণ গাছা
আপন মনে খেলিছ কোণে,
কাটিছে সারা বেলা।
হাসি গো দেখে এ ধূলি মেখে
এ তৃণ লয়ে খেলা॥"[৭]

কবি বলছেন—ধুলাবালি নিয়ে, খড়কুটো নিয়ে এই খেলার অর্থ আমরা খুঁজে পাই না। আমাদের শ্রেণী 'বেড়ায় খুঁজি করিতে পুঁজি, সোনা-রূপার ঢেলা।' আর শিশু অত্যন্ত সহজ মনে,—

"যা পায় চারিদিকে
তাহাই ধরি তুলিছে গড়ি
মনের সুখটিকে।"[৮]

৬। শিক্ষা—পৃঃ ৮৩, ৭। শিশু—পৃঃ ২৮, ৮। শিশু—পৃঃ ২৮

তাই রবীন্দ্রনাথ 'আবরণ' প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—শিশুর সাত বৎসর পর্য্যন্ত তার জীবনের সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্য্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবী-মায়ের কোলে গড়াইয়া ধুলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

"We all know children are lovers of the dust; their whole body and mind thirst for sunlight and air as flowers do. They are never in a mood to refuse the constant invitations to establish direct communication which come to their senses from the universe. ......

Our childhood is the period when we have or ought to have more freedom—freedom from the necessity of specialization into the narrow bounds of social and professional conventionalism."[১০] (My School)

শিশুর মনোবিকাশের এই রীতি অনুযায়ীই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ রেখে প্রাচীনকালের আশ্রম-পরিবেশে শিশু-শিক্ষার প্রবর্তন করেছেন।

শিশুজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'ছন্দপ্রিয়তা'। ছন্দের গুরু রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। বাল্যকালে বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' পাঠকালে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে',—এই কথা কয়টির ছন্দ তাঁর শিশুমনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। কথা কয়টির মধ্যে মিল থাকাতে—তার ঝঙ্কার যেন পড়বার পরও বিদ্যমান থাকে, মাঝে মাঝে শিশুমনকে দোলা দেয়, 'শেষ হইয়াও যেন শেষ হয় না'। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,'—এই ছড়াটি ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে একটি বিখ্যাত ছড়া।

৯। শিক্ষা—পৃঃ ৮৪, ১০। *Personality : Page 117*

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহ-মন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই।"

কবি ঠিক শিশুমনের মাঝখানটিতে বাসা নিতে চেয়েছেন। তা হলে শিশুর মন দিয়ে জগতকে বুঝতে পারবেন—এই আশা করেছেন। খোকার রাজ্যে বাস্তবজগতের নিয়ম তেমন চলে না।

কবি বুঝেছেন,—

"খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁষে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টি শেষে
সকল উদ্দেশ-হারা
সকল-ভূগোল ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে।" (শিশু—পৃঃ ৩৩)

শিশুর মনের রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করলেন কবি, তাঁর নিজের মধ্যে যে চিরকালের শিশু আছে তার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে। তাঁর এই আবিষ্কারের কথা তিনি সুন্দর করে বলেছেন 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে।—

"প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"[১১]

শিশুচরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য, রবীন্দ্রনাথ শিশুদের প্রিয় জিনিসের দিকে নজর দিলেন। শিশুরা ছড়া ভালবাসে। 'ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি' তিনি বিশ্লেষণ করে দেখলেন,—এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে! এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ওগুলি আজ রচিত হলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হলেও চিরনূতন। এই ছড়াগুলি অধিকাংশই অর্থহীন চিন্তার সমষ্টি হলেও শিশুমনের নিকট এগুলির একটি চিরন্তন আবেদন আছে। তার কারণ এই যে,—

১১। শিশু ভোলানাথ—পৃঃ ৮৭

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতন পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে,—অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে শিশু প্রকৃতির সৃজন, কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।"[১২]

'ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি' আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন—শিশু যেমন বহুল পরিমাণে প্রকৃতির সৃজন, তেমন ছড়া ও ছন্দের ক্ষেত্রে সে এমন জিনিস পছন্দ করে যা বহুল পরিমাণে স্বাভাবিক, কৃত্রিমতা দোষ বিবর্জিত। শিশুর মন একটি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে ভালবাসে না। যেমন খেলার ক্ষেত্রে, তেমনি চিন্তার ক্ষেত্রে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে শিশুর মন বিচরণ করে। এই ব্যবহারই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। শিশুমনের অপরিণত গঠনের জন্য, একটি বিষয়ে বেশিক্ষণ মনসংযোগের ক্ষমতা তার থাকে না (Shifting Attention)। ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি শিশুর মনের এই বিশেষ ধর্ম অনুযায়ী রচিত হয়েছে। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়া মাত্র।"

শিশুর পক্ষে বয়স্ক মনের ধারাবাহিকতা, একত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। সে তার চিরচঞ্চল মানসপটে বিভিন্ন ঘটনার অসংলগ্ন দাবিতেই বেশি আনন্দ পায়। ছোট, বড়, সামান্য, অসামান্য কোন ঘটনাই তাতে বাদ পড়ে না। বাস্তবজীবনে সে যেমন ফেলাছড়া করতে, গড়তে ভাঙতে ভালবাসে, কল্পনার রাজ্যেও সে তেমন অর্থসংগতির অপেক্ষা করে না; আপন চঞ্চল মনের অনুবর্তী হয়ে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আপনার মনকে নিযুক্ত করে।

১২। সংকলন (ছেলে ভুলানো ছড়া)—পৃঃ ১৩০

রবীন্দ্রনাথ শিশুর এই চঞ্চল মনের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'কাবুলীওয়ালা' গল্পে।

"আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি একদণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। ...

"মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, 'বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না, না ?'

"আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞান দান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। 'দেখো বাবা, ভোলা বলছিল, আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে। কেবলি বকে, দিন রাত বকে।'

"সে পরক্ষণেই আবার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

"... হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।' "

এই সঙ্গে শিশুমনের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন—শিশুরা অত্যন্ত গল্পপ্রিয়। নানা প্রকারের গল্প শুনতে শিশুরা ভালবাসে। শিশুর গল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে এই গল্পের ঘটনায় অসম্ভব কিছুই নেই। শিশু সমস্তই বিশ্বাস করতে ভালবাসে। বয়স্ক পাঠকদের মতো লেখককে ঠকাবার মতলবে শিশুরা গল্প শোনে না। কোন ঘটনাই শিশুরা বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে না। তার কারণ বোধ হয়—শিশুদের বাস্তব

অভিজ্ঞতা কম। বয়স্কদের সঙ্গে এইখানেই শিশুমনের তফাৎ। শিশুমনের এই বিশেষত্বটুকু রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বলেছেন,—[১৩]

"ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে, 'প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।' বালক সেইটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এই জন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য-উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ।··· শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এই জন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি—তখন জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না, এবং শিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটি কোন্‌টুকু।"

শিশুমনের এই সরল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রত্যেক দেশের রূপকথা রচিত হয়েছে। শিশুমনের বিকাশের জন্য গল্পের যে প্রয়োজন আছে এতে কোন সন্দেহ নাই। বিভিন্ন শিক্ষাবিদদেরও এই মত। তবে শিশুদের গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। ডাঃ মন্তেসরীর মতে অবাস্তব খেলা ও গল্প শিশুর মনো-বিকাশের জন্য আদৌ উপযুক্ত নয়। ফ্রোয়েবল আবার কাল্পনিক খেলা ও গল্পের স্বপক্ষে মত দিয়েছেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোন নির্দিষ্ট মত আমরা পাই নি। রূপকথা সম্পর্কে তাঁর মতামত আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু তাঁর শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি—ঐগুলির মধ্যে তিনি কোন অসম্ভব কাল্পনিক বিষয়বস্তু অন্তর্ভূত করেন নি। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে শি[illegible] পরিচিত ঘটনাগুলিই তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

গল্প শোনার চাইতেও শিশুরা বেশী ভালবাসে খেলা করতে। শিশুর খেলাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদগণ খেলার সাহায্যে শিক্ষা দেবার কথা চিন্তা করেছেন। Playway Method বা 'খেলাচ্ছলে শিক্ষাপদ্ধতি' আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে সুপরিচিত। আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্রিগণ স্বীকার করেছেন—শিশুর শারীরিক ও

১৩। বিচিত্র প্রবন্ধ (অসম্ভব কথা)—পৃঃ ৫৯

ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য এই খেলা বিশেষ প্রয়োজন। শিশুদের মনগড়া খেলার প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বক্তব্য এই যে, শিশুর প্রথমজীবনের প্রায় সমস্ত খেলা মাকে কেন্দ্র করে চলে। ফ্রোয়েবল এই শ্রেণীর খেলাকে বলেছেন 'মায়ের খেলা' বা Mother Play। মা শিশুর সঙ্গে যে সমস্ত খেলা করেন শিশুও পরবর্তী অবস্থায় তারই পুনরাবৃত্তি করে। রবীন্দ্রনাথও এই জিনিসটি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থে এই সম্পর্কে নানা কবিতার উল্লেখ আছে। শিশুশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত এই যে, তা আনন্দের মধ্য দিয়ে, খেলার মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত। এবং এটি সম্ভব যদি শিশু আপন পরিচিত পরিবেশে আপন স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ পায়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিশুজীবনের অন্য একটি তাৎপর্য বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। শিশুকে তিনি দেখেছেন 'স্বাধীনতার পূজারী' হিসাবে। বোধ হয় স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ শিশুর বিকাশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। শিশুর চতুর্দিকে যারা স্বাধীন, বন্ধনহীন তাদের জীবনের প্রতি শিশুর একটি বিশেষ আগ্রহ আছে।

শিশুর মনোবিকাশের সূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি শিশুর মনে বন্ধন ও মুক্তির দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত কাজ করছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার দ্বারাই শিশু আপনাকে বৃদ্ধির দিকে চালিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তালগাছ' কবিতায় একটি রূপকের মাধ্যমে শিশুমনের এই দ্বন্দ্বের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়—
একেবারে উড়ে যায়—
কোথা পাবে পাখা সে ?"

সারাদিন ধরে তালগাছের সাধনা—

"আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
উড়ে যেন যাবে ও।"

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনটি ফিরে আসে। সে ভাবে,—

"মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আর বার
পৃথিবীর কোণটি।"

(শিশু ভোলানাথ—পৃঃ ১৬)

আমরা লক্ষ্য করেছি স্বাধীন ও বন্ধনহীন জীবনের প্রতি শিশুর একটি বিশেষ আগ্রহ আছে। রবীন্দ্রনাথ শিশুচরিত্রের এই বিশেষ দিকটি নানাবিধ রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। দূরে অশ্বত্থ-তলায় কণ্ঠীগলায় একতারাটি হাতে নিয়ে 'বাউল' যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন শিশুর ইচ্ছা জাগে 'বাউল' হতে। শিশুর মনে শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের একটি বিপুল আগ্রহ আছে। এইজন্যই বোধ হয় বাউলের চির স্বাধীন ভাবটি তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

কারণ, বাড়ি ফেরার তরে বাউলকে

"কেউ না তাড়া করে,
তার নাই কোনো পাঠশালা।
সমস্ত দিন কাটে—
তার পথে ঘাটে মাঠে
তার ঘরেতে নেই তালা।"

আর শিশুর—

"ঘরে বন্ধ চাবি
বেরুতে পথ নাই।"[১৪]

শিশু বন্ধনকে ভয় করে। জীবনের চারিদিকে বিধি নিষেধের প্রাচীর পেরিয়ে আলোকের দিকে তাদের স্বাভাবিক গতি। শিশু-

১৪। শিশু ভোলানাথ (বাউল)—পৃঃ ৫০

মনের এই গতিয় (Dynamic) দিকটার বর্ণনা কবি করেছেন তাঁর 'ডাকঘর' নাটকটিতে একটি রূপকের মাধ্যমে। 'অমলের' আকাঙ্ক্ষা বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য ও কর্মের সঙ্গে সে আপনার যোগ স্থাপন করবে। বাইরের ডাকে তার মন চঞ্চল। অমল যতোই গৃহের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়, তার প্রাচীনপন্থী অভিভাবক ততোই তাকে গৃহের মধ্যে আটকে রাখতে চান। মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের চিরন্তন দ্বন্দ্বের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে করেছেন।

কবিরাজের উপদেশে অমলের অভিভাবক মাধবদত্ত অমলের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। মাধবদত্ত জানেন ছেলেমানুষ অমলকে ঘরে আটকে রাখা কঠিন। কিন্তু অমলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তিনি এই ব্যবস্থায় রাজি হ'ন।

অমল বলল,—"পিসে মশায়, আমি ওই উঠোনটিতেও যেতে পারব না। ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন, ওই দেখোনা যেখানে ভাঙ্গা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে কাঠবিড়ালী কুটুস খুটুস করে খাচ্ছে,—ওখানে আমি যেতে পারব না ?"

কিন্তু অমলের বের হওয়া তো বারণ। তাই অমল চাইছে কাঠবিড়ালী হতে,—ভাবছে,—"আমি যদি কাঠবিড়ালী হতুম তবে বেশ হ'ত।"

মাধধদত্তের ধারণা পুঁথি পড়লেই মানুষ সব জানতে পারে। কিন্তু শিশুহৃদয়ের তৃপ্তি কেবলমাত্র পুঁথির সাহায্যে সম্ভব নয়। বৃক্ষশিশুর মতো শিশুরাও প্রকৃতির কোলে আপন ধর্মে বেড়ে উঠতে চায়।

"অমল। পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে।

"মাধবদত্ত। বেশ। তাও বুঝি জানো না।

"অমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়িনি—তাই জানি নে।

"মাধবদত্ত। দেখো বড়ো বড়ো পণ্ডিতরা সব তোমারই মতো—তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

"অমল। বেরোয় না?

"মাধদত্ত। না, কখন বেরোবে বলো। তারা বসে কেবল পুঁথি পড়ে, আর কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে,—বসে বসে এই এত বড়ো সব পুঁথি পড়বে, সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

"অমল। না, না পিসেমশায়, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না—পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না।

"মাধবদত্ত। সে কী কথা অমল। যদি পণ্ডিত হতে পারতুম তা হলে আমি তো বেঁচে যেতুম।

"অমল। আমি যা আছে সব দেখব—কেবলই দেখে বেড়াব।"

সমস্ত নাটিকাটিতেই বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য শিশু-মনের প্রবল ইচ্ছাই ব্যক্ত হয়েছে। যে মানুষটি বাঁশের লাঠি কাঁধে নিয়ে, নাগরা জুতো পরে, মাঠের পথ দিয়ে, পাহাড়ের দিকে যায় কাজ খুঁজতে, তার মাঝে অমল দেখতে পায় মুক্তির আনন্দ। যে 'দইওয়ালা' গ্রামের পর গ্রামে দই ফিরি করে ফেরে, 'দই,—দই, ভাল দই'—হেঁকে, অমল তার সঙ্গে নিজের বন্দীজীবনের বিনিময় করতে চায়। এমন কি 'পাহারাওয়ালা' ও 'মোড়ল'কেও সে মুক্ত জীবনের প্রতীক হিসাবে দেখে। অমলের ঘরের জানালার পাশ দিয়ে যখন ছেলের দল খুসির স্রোতে ভেসে খেলতে যায়, অমল তাদের সঙ্গে আপনার ভাগ্য বিনিময় করতে চায়। কিন্তু সমাজের 'কবিরাজেরা' এবং 'মাধবদত্তেরা' তাকে নানা বিধিনিষেধের জালে আটকে রাখে।

কিন্তু 'ঠাকুরদা' আসেন ছেলে খেপাবার সর্দার হয়ে। তিনি চিরকালের শিক্ষক। তাঁর ডাকে ছেলের দল অন্ধকারের বাঁধন কেটে নূতন আলোয় ছুটে আসে। রবীন্দ্রনাথ এঁদের বলেছেন 'জাত শিক্ষক'। এঁরা আপন সাধনার জোরে শিশুদের পুঁথির বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাদের স্বভাবধর্মে প্রতিষ্ঠা করে দেন।

আপন স্বধর্ম থেকে বঞ্চিত করলে যে শিশুমনের মৃত্যু হয়, অন্য একটি রূপকের মাধ্যমে কবি অন্যভাবে বলেছেন। পুঁথির নিচে শিশু-

মনকে চাপা দিয়ে দেশজুড়ে যে নিষ্ঠুর শিক্ষাব্যবস্থার প্রহসন চলেছে, রবীন্দ্রনাথের 'তোতা কাহিনী' রূপকটি তারই শ্লেষাত্মক প্রকাশ।

"এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত। জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে।…রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—'পাখিটাকে শিক্ষা দাও'।' যথানিয়মে রাজার 'ভাগিনারা' শিক্ষার ভার পেল। পাখির শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সভা বসল, সভায় আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, "সামান্য খড়খুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।"

সোনার খাঁচা বানানো হল। পণ্ডিতদের উপর ভার পড়ল শিক্ষা দেবার। পর্বত প্রমাণ পুঁথি নিয়ে শিক্ষাদানের প্রহসন চলল। পুঁথি ও উপকরণের আড়ালে পাখিটার কথা কেউই মনে রাখল না।

পণ্ডিতদের চীৎকারে, পুঁথির চাপে এবং উপকরণের ভারে- "পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাব দোষে সকাল বেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট্ করে।"

"এদিকে পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

পাখিটা মরিল।…

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ওকি আর লাফায়'।

ভাগিনা বলিল,—'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে।'

'না'।

'আর কি গান গায়।'

'না'।

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।'

'না।'

রাজা বলিলেন,—'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না; হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজগজ করিতে লাগিল।

বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।"—(লিপিকা)

আমরা বলেছি শিশুজীবনের সাধনা আপনাকে বিকশিত করবার সাধনা, নিজের শরীরের ও মনের অক্ষমতা থেকে মুক্তির সাধনা। এই ভাব সুস্পষ্ট হয় যখন শিশু বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ যৌবনে পদার্পণ করে। এই বয়সে বাল্যের আত্মনির্ভরতা থাকে না, শরীরে ও মনে নানা পরিবর্তন আসে। শিশু যেন নূতন এক জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়। কৈশোরে শিশুর জীবনে ভাবপ্রবণতা বেড়ে যায়, তার মন দুঃখ ও আনন্দের দোলায় দুলতে থাকে। এই বয়সে শিশুর জীবনে যেমন সহানুভূতির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আত্মবিস্তারের সুযোগের।

কৈশোর ও যৌবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করেছেন। "ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনা কাতরতায় ভরা। এই সময়ে অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র

প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানব-সংশ্রবের জোর তার 'পরে যতটা খাটে এমন আর কোনো সময়েই নয়।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন,—"এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গ প্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল। স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া চলিয়াছে। এই জন্যই আমাদের দেশ বলে: 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।' তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরাপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে, কেন না, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংশ্রব এই বয়সেই দরকার। এইজন্যই সকল দেশের য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সেই সুযোগে তাদের জীবনের 'পরে মানবসংশ্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে—এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। এই জন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্ব লাভের যখন বয়স আসে তখন আত্ম-সম্মান বোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।" (শিক্ষা—পৃঃ ২১০)

এই বয়সে শিক্ষকদের কাজ একটু জটিল। কারণ এই বয়ঃসন্ধি-কালেই ছাত্ররা সামান্য ব্যাপারে মাঝে মাঝে হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে। কিন্তু যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সেখানে জটিলতা তত গভীর নয়; 'এই বয়সে ছাত্ররা ভক্তি করতে পারলে আর কিছুই চায় না। অধ্যাপকদের কাছ থেকে একটুমাত্র খাঁটি স্নেহ এরা যদি পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করে দিয়ে এরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।[১৫]

১৫। শিক্ষা—পৃঃ ২১১।

শিশুপ্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী তার শিশুচরিত্রের ব্যাখ্যাও তদনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের (Experimental Psychology) গবেষক ছিলেন না, তবুও নিজের অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে তিনি শিশুচরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির দিকে আলোকপাত করেছেন। এইগুলি মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণালব্ধ ফলের সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয়। শিশুমনের বিকাশের ধারা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী তিনি শান্তিনিকেতনে শিশুর স্বাধীন প্রকৃতির অনুকূল করে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি শিক্ষাবিধি রচনা করেছিলেন। আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

রবীন্দ্র-শিক্ষাপদ্ধতি

শিশুদের শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির অনুকূলে মত প্রকাশ করেননি। শিশুচরিত্রের মধ্যে তিনি নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছিলেন; এই কারণে বোধ হয় শিশুশিক্ষার জন্য কোন একটি মাত্র শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর নিকট উপযুক্ত মনে হয় নি। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা প্রকারের উদ্ভাবিত হইতেছে। একদল বলিতেছে ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত; আর একদল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। একদল বলিতেছে, চোখে, কানে, ভাবে, আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই ব্যবস্থা; আর একদল বলিতেছে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক।" (শিক্ষা—পৃঃ ১৬১)

রবীন্দ্রনাথ পরস্পরবিরোধী শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে বিশেষ একটিকে শিক্ষাদানের জন্য মেনে নিতে চাননি। কারণ তাঁর মতে মানুষ নানা উপায়ে শিক্ষালাভ করে। "সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই।" মানুষের জীবন যেমন জ্যামিতির সরল রেখা নয়, তেমনি তার শিক্ষার পদ্ধতিও বিভিন্ন। সকলের পক্ষে একই নিয়ম চলে না। তবে সাধারণক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃতি যখন সজীব থাকে, তখন সে আপনার অন্তরের শক্তির দ্বারাই শিক্ষা লাভ করে।

য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রণালী রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—"য়ুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানাভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংশ্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।" (শিক্ষা—পৃঃ ১৬২)

সুতরাং প্রকৃত শিক্ষার জন্য কোন নির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। চিত্তের গতি হতেই শিক্ষার পথ ঠিক করতে হয়। কিন্তু যেহেতু মানুষের জীবনের গতি বিচিত্র এবং ইহাকে কেহ স্পষ্ট করে দেখতে পায় না, এইজন্য কোনদিনই কোন একজন লোকের পক্ষে কোন বিশেষ পথ দৃঢ়ভাবে নির্দিষ্ট করা কঠিন। নানা লোকের পরীক্ষা ও চেষ্টার সাহায্যেই সহজ পথটি আবিষ্কার করে নিতে হয়।

ব্যবহারিক সুযোগলাভ এবং মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন উভয়কেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ব্যবহারিক সুযোগলাভের মধ্যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, দক্ষতা অর্জন বুঝায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই শিক্ষার প্রধান বিষয় বলে

মেনে নিতে পারেন নি,—তিনি বিশ্বাস করেছেন যে পাঠ্যবিষয়ের উদ্দেশ্য যে উহা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করবে।

এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—"নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাহি না। কেন না আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না।"

(শিক্ষা—পৃঃ ১৬৬)

শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে তিনি যে বিশেষ সত্যের উপর জোর দিয়েছেন তা হচ্ছে যে মানুষ একমাত্র মানুষের কাছ থেকেই শিখতে পারে। "শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষা বিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাকে বুঝতে পারে।" —(শিক্ষা—পৃঃ ১৬৬) আমরা উপযুক্ত শিক্ষক পাই না বলেই প্রণালীর উপর আমরা নির্ভর করতে চাই। আমরা শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে চাই প্রণালীর দ্বারা।

ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাস থেকে রবীন্দ্রনাথ আপনার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি খুঁজেছেন। "এদেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধাবিধানের বাঁধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।"

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম দিকের কয়েকজন শিক্ষকের নাম রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। "ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ডসন, ডেভিডহেয়ার—ইঁহারা শিক্ষক ছিলেন—শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না।"

আমরা বলেছি কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন

মতামত প্রকাশ করেন নি। তিনি পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। আমেরিকার জন ডিউই এই মতের পরিপোষক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সবল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে।"

তবে পরীক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কারই নয়। কারণ, প্রণালীর ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থানই সর্বাগ্রে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম; আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারা শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারা প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।" (শিক্ষা—পৃঃ ১৬৭)

শিক্ষক যদি প্রাণ দিয়ে পড়াতে পারেন—তবে শিক্ষাদানের জন্য কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি না মানলেও চলে। কারণ কোন পদ্ধতিই আমাদের শেখাতে পারে না, শিক্ষকই শিক্ষা দান করেন। এইরূপ যে শিক্ষক, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের গুরুর আসন দিয়েছেন।

"গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষা-কার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।"
(শিক্ষা—পৃঃ ১৬৮)

শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষকদের স্থান প্রধান হলেও, শিক্ষকের কার্যের শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'পদ্ধতি'র প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিধি সাধারণত ভাবানুষঙ্গ (Association of Ideas) নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত। হার্বার্টের পঞ্চসোপানও এই অনুষঙ্গ নীতিরই অনুসারী। রবীন্দ্রনাথও এই শিক্ষাবিধির প্রধান সূত্রগুলি মেনে নিয়েছেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা,-

"জ্ঞান শিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।" (শিক্ষা—পৃঃ ২১)

অথবা,—"প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিস্ফল হইতে থাকে।" (ঐ—পৃঃ ২৩)

অথবা,—"শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে একসুরে। সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না।"

আধুনিক শিক্ষাবিধি স্বীকার করে যে শিক্ষার্থীকে পরিচিত বিষয় থেকে অপরিচিত বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে, সহজ বিষয় থেকে কঠিন বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং মূর্ত বিষয়বস্তুর সাহায্যে বিমূর্ত বিষয়বস্তুর আলোচনা করতে হবে। উপরের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিধির এই প্রধান বিষয়গুলি সাধারণ ভাবে মেনে নিয়েছেন। শিক্ষাবিধির এই নিয়মগুলি যে যৌক্তিক এবং মনস্তত্ত্বসম্মত এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

জীবনের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্নস্তর (Stage) অতিক্রম করে বৃদ্ধির দিকে যেতে হয়,—জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও তেমনি কয়েকটি ধারাবাহিক স্তরের বা সোপানের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন, যা অতিক্রম করে আমরা পূর্ণতর জ্ঞানের দিকে আমাদের চিত্তকে চালিত করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়, কিন্তু সেই যোগ আংশিক। সেইজন্য ব্যাপকতর যোগের জন্য আমরা মনের সাহায্য নিই। মনের দ্বারা আমাদের বিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানময় যোগ ঘটে। কিন্তু এই যোগ সম্পূর্ণ যোগ নয়—এর সাহায্যে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী আমরা হতে

পারি না। এই জন্য আমাদের পরবর্তী সাধনা, বোধের দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চৈতন্যময় যোগ স্থাপন করা। বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ স্থাপিত হয়,—তা একেবারে পরিপূর্ণ।

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকেও আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে।[১]

জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে আমরা যদি উক্ত ধারাবাহিকতাকে গ্রহণ করি, তা হলে পদ্ধতির ক্ষেত্রেও আমাদের ঐরূপ ব্যবস্থা মানা প্রয়োজন। রবীন্দ্র-শিক্ষানীতি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, শিশুকে তিনি প্রথমে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে এনে, বস্তু ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান পুষ্ট করতে চান। বস্তু ও প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে শিশুর ইন্দ্রিয়বোধ জাগ্রত হবে এবং ধীরে ধীরে বস্তু সম্পর্কে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান শিশুর আপন অভিজ্ঞতার অংশস্বরূপ হয়, তা শিশুর নিজস্ব জ্ঞান। শিক্ষাবিদগণ এইরূপ জ্ঞানকে বুনিয়াদী জ্ঞান বা মূল জ্ঞান (Key Knowledge) বা প্রাথমিক জ্ঞান বলেছেন। এই জ্ঞান শিক্ষার্থীর জীবনের অভিজ্ঞতার অংশ, প্রাণের সঙ্গে যুক্ত। এই কারণে এই জ্ঞানের সঙ্গে প্রাণের অন্তরঙ্গতা থাকে। এই জ্ঞান শিশুর নিকট সত্য জ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ শিশুর জ্ঞান বিকাশের এই সূত্রটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এইজন্য তিনি শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রান্তরে, আম্র-কাননের ছায়ার মধ্যে শিশুদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে-ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—

"আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারিদিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার

১। শিক্ষা—পৃঃ ১২৪

সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে পারে।" (বিশ্বভারতী—পৃঃ ৭৭)

আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগ স্থাপন করি। মনস্তাত্ত্বিকেরা এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বলেছেন গ্রাহক যন্ত্র বা Receptors. ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিশু প্রথম বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষার ফলে তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয় এবং শরীর ও মন সহনশীল হয়। বিশ্বপ্রকৃতিই শিশুর প্রথম শিক্ষক। এই শিক্ষার ফলেই শিশু বাইরের সঙ্গে আপন মনের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বলেছেন,—

"মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পুর্ণ হয় না। শীত গ্রীষ্মে কোন কালে আমাদের মুখ ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত, অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে।" (শিক্ষা—পৃঃ ৮৩)

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতার উপরই যে আমাদের শিক্ষালাভের দক্ষতা নির্ভর করে—এই সত্য ফ্রোয়েবল ও মন্তেসরী উভয়েই গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের কিছু পার্থক্য আছে। ফ্রোয়েবল ও মন্তেসরী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা সাধনের জন্য নানারূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন; কিন্তু তিনজনেই শিশুর পরিপূর্ণ চিত্তবিকাশের জন্য স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। মন্তেসরী ও ফ্রোয়েবল শিশুর বিকাশের উপযোগী কর্মের একটি নির্দেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই ধরনের নির্দেশকে শিশুর চিত্তবিকাশের প্রতিকূল মনে করেছেন। তবে তিনিও কিছু উপযোগী কর্মের উল্লেখ করেছেন তাঁর বিভিন্ন শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে। কিন্তু এই সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য যাতে শিশু স্বাধীনভাবে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করে আপনাকে বিকাশের পথে চালিত করতে পারে। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ভাবে বলেছেন,—

"এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষালাভ করবে। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে।"

উদার প্রকৃতির পরিবেশে বিদ্যালয় স্থাপন করলে তা শিশুর চিত্তবিকাশের অনুকূল হয় একথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু যে পর্যন্ত না শিশু কোন কর্মে অংশগ্রহণ করে, সে পর্যন্ত সে কিছুই শিখতে পারে না। আমরা শিশুর মনোবিকাশের ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে কাজ করা, খেলা করা, জিনিস গড়া ও ভাঙা শিশুর স্বভাবধর্ম। শিশুর শিক্ষা হবে এই স্বভাবধর্মের অনুকূল, তার জীবনযাপনের অংশ হিসাবে। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত না হলে,—জীবনের সঙ্গে একতালে একসুরে না চললে শিক্ষা বাইরের জিনিস হয়ে থাকে। তার সাহায্যে আমাদের জীবনের প্রয়োজন মেটে না।

উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে গঠনমূলক (Constructive) কর্মের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শিশু-শিক্ষার কল্পনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ।··· সেটা ক্লাস নাম-ধারী খাঁচার জিনিস হবে না।··· আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহ মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার।" (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ৪৪)

উপরের বক্তব্যের সঙ্গে ডিউই-এর শিক্ষানীতির একটি সুন্দর মিল দেখতে পাচ্ছি। 'কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা' (Learning by Doing) ডিউই-এরও শিক্ষা-দর্শনের মূল পদ্ধতি। আবার ডিউইও জীবনযাপনের সঙ্গে শিক্ষার একটি বিশেষ সম্পর্ক দেখেছেন। 'কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা'

এই নীতির বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ডিউই-এর 'প্রোজেক্ট পদ্ধতি'র (Project Method) মধ্যে। কর্ম সম্পাদনে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে ভিত্তি করে একটি বিশেষ সমস্যামূলক কর্ম সম্পাদনে শিশুকে নিযুক্ত করাই প্রোজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। প্রোজেক্ট পদ্ধতির দোষগুণ বিচার করা এ স্থানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথ ও ডিউই দুইজনই কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন বটে তবে শিক্ষাব্যাপারে কর্মের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য উভয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের কোন কর্মকে বিদ্যালয়-পরিবেশে নূতনভাবে অভিনয়ের ভঙ্গিতে শিশুদিগের দ্বারা সম্পাদন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে এইরূপ কোন কর্মের উল্লেখ করেননি। তিনি যে সমস্ত কর্মের উল্লেখ করেছেন—তাতে শিশু বিদ্যালয়-সমাজের একজন সভ্য হিসাবে অংশ গ্রহণ করবে। এই কর্মের প্রকৃতি এই যে, এই সমস্ত কর্ম শিশুর জীবনের অংশ এবং এই সমস্ত কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা শিশুর নিজস্ব আগ্রহ প্রসূত। বৃহত্তর সমাজ-জীবনের কর্ম শিশুর বিদ্যালয়ের জীবনের অন্তর্ভূত না করে, (যেমন্ প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে, উদাহরণ : দোকান-প্রোজেক্ট বা ডাকঘর-প্রোজেক্ট ইত্যাদি) শিশু-বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্বতস্ফূর্ততার মধ্যে যে সমস্ত কর্মের প্রয়োজন আপনার জীবনে অনুভব করবে, সেই সমস্ত বিশেষ ধরনের বিভিন্ন কর্ম রবীন্দ্রনাথ আপনার বিদ্যালয়ে অন্তর্ভূত করতে চেয়েছেন। বর্তমানে 'শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রকার মনোযোগের বিষয়'। শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত বিশেষ কর্মের উল্লেখ করেছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা। প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের আবেগে শিশু বিভিন্ন কর্মে অংশ গ্রহণ করবে। 'পর্যবেক্ষণ' এবং 'পরীক্ষার' সাহায্যে সে কর্মের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করবে। এই কর্মের

উদ্দেশ্য শিশুকে প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে সংশ্রব স্থাপনে সাহায্য করা। কারণ,—

"প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব এবং নিষ্ফল হইতে থাকে।" (শিক্ষা—পৃঃ ২৩)

শিশু-শিক্ষার জন্য রবীন্দ্র-পরিকল্পনায় পুঁথির স্থান গৌণভাবে রয়েছে; আধুনিক অনেক শিক্ষাবিদদের মত তিনি পুঁথিকে নির্বাসন দিতে চান নি। পুঁথিকে তিনি গ্রহণ করেছেন জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে। পুঁথি পড়াটাকেই তিনি জ্ঞান অর্জন হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন,—"আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্ত পুঁথির শিক্ষা।... আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়, বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়।... বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। বালক অল্পমাত্র ও যেটুকু শিখিবে তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না; শিক্ষার উপরে সেই চাপিয়া বসিবে।" (শিক্ষা—পৃঃ ৯৭)

রবীন্দ্র শিক্ষাপদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দিয়েছেন। যে সমস্ত কর্মের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে শিশুমনের যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন আমরা পরে তা উল্লেখ করেছি। সমস্ত কর্মই যে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তা নয়। তবে তিনি তাঁর শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গে এইগুলির আলোচনা করেছেন।

নানাপ্রকারের পাথর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক বস্তু সংগ্রহ:

বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহের প্রবৃত্তি শিশুমনের সহজাত। এই ধরণের সংগ্রহের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে শিশুর পরিচয় হয় ও এই ভাবে শিশুর পক্ষে বস্তুপ্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ ঘটে। নানা প্রকারের পাথরের নুড়ি সংগ্রহ, ডাক টিকিট সংগ্রহ, ঝিনুক সংগ্রহ

প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য শিশুর বয়স-ভেদে সংগ্রহের উপযোগী বস্তুপ্রকৃতির তারতম্য ঘটে। এই সংগ্রহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' নামক গ্রন্থে। "আমি সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানা রকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই।" (শিক্ষা— পৃঃ ৫১)

পাখি, মাছ ও ছোট জন্তু পালন ঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভের সঙ্গে হৃদয়ের বিকাশ সাধন করা। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন ছোট বেলা থেকে যদি শিশুদের নানাবিধ গৃহ পালিত জীবজন্তু পালন ও সেবা করবার সুযোগ দেওয়া হয় তা হলে তাদের হৃদয়ের কোমল অনুভূতিগুলি জাগ্রত হয় এবং তাতে শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটে। 'শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ-এর সংকলন গ্রন্থে উল্লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোটো জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালদিগকে বশ করাইতে পারে।" (শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ৪০)

বৃক্ষরোপন, উদ্যান তৈয়ারী ও উদ্যানের নিয়মিত যত্ন ঃ

রবীন্দ্রনাথ আশ্রম-পরিবেশে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই বৃক্ষরোপন ও উদ্যান তৈরির ব্যবস্থা রাখতে চেয়েছেন। জীবজন্তু, পাখি, মাছ পালনের

মত বৃক্ষরোপন ও উদ্যান তৈরির সাহায্যেও ছাত্রদের হৃদয়ের কোমল অনুভূতি সমূহের স্ফুরণ হয়। রবীন্দ্রনাথ শিশুর সমগ্র সত্ত্বার বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন; সুতরাং এই কারণেই বিদ্যালয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বৃক্ষরোপন ও বাগানের যত্ন ছাত্রদের একটি বিশেষ কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত—রবীন্দ্রনাথ এ কথা উল্লেখ করেছেন 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম'[২] পুস্তকে।

কর্মে স্বাবলম্বন:

নিজেদের কাজ নিজেদের দ্বারা করবার ক্ষমতা অর্জন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা বাল্যকাল থেকে স্বাবলম্বী না হলে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। 'কর্মের সাহায্যে যে আমরা শিখি'—এই নীতি আধুনিক শিক্ষাবিদগণ প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছেন। এই কাজ শুধু-মাত্র বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট হোম টাস্ক (Home Task) নয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের দৈনন্দিন কার্য ছাড়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মও তাদের অংশ অনুযায়ী সম্পাদন করবে। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের উপদেশ ও কার্যপ্রণালী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"লাইব্রেরী গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতি অর্পণ করা উচিত। ··· ছাত্রেরা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়।"[৩]

চড়িভাতি:

আনন্দের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দ্বারা চড়িভাতি করার কথা বলেছেন। "রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।"[৪]

সেবাশুশ্রূষার কাজ:

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য যে শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণের বিকাশ, এ কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকস্থানে উল্লেখ করেছেন। সহপাঠীদের

২। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ৪০, ৩। ঐ—পৃঃ ৪০, ৪। ঐ—পৃঃ ৪১

অসুস্থতায় সেবা করা, ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ছাত্রদের কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। ভৃত্যদের সঙ্গেও ছাত্রদের ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। "ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়।"[৫]

খেলা :

শিশুর শরীর ও মনোবিকাশের জন্য খেলার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়েও তিনি নানা খেলার প্রবর্তন করেছিলেন। এমন কি ক্লাসে পড়াবার সময় তিনি খেলার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন।

গল্পশোনা—গল্পবলা—রামায়ণ-মহাভারত পাঠ :

শিশুর মনোবিকাশের জন্য, কল্পনাশক্তি প্রসারের জন্য গল্পের প্রভাব খুব বেশি। শিশুমনের যাদুকর কবি নানা ছলে শিশুদের গল্প শোনাতেন এবং শিশুদেরও গল্প বলতে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু ভারতীয় শিশুদের মনোবিকাশের জন্য রামায়ণ-মহাভারত পাঠের প্রয়োজনের উপর তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

নাটক রচনা, অভিনয়—সঙ্গীত ও নৃত্য—ঋতু উৎসব :

রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে বলেছেন আনন্দের মাধ্যমেই শিশু শিক্ষালাভ করে। এই আনন্দের জন্যই শিশু গান গায়, নাচে, কবিতা আবৃত্তি করে, ঘুমপাড়ানী গানের সুরের সঙ্গে, তালের সঙ্গে আপনার অন্তরের যোগ স্থাপন করে। রবীন্দ্র শিক্ষানীতিতে এই জন্য অভিনয়, সঙ্গীত,

৫। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ৪০

উৎসবের আধিক্য এত বেশি। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে এদের স্থান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি।··· ছেলেদের জন্য নানা রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি। তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। ··· তাদের চিত্ত-বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি—তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। ··· তাদের খেলা-ধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এই সব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধ ভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে—অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু একথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। ··· নানা ঋতু উৎসবের প্রচলন হয়েছে; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।" (বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৪৩)

কারুকার্য ও শিল্পকলা—কাঠের কাজ, মাটির কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি:

রবীন্দ্র শিক্ষা-পরিকল্পনায় নানাবিধ হাতের কাজ, ছবি-আঁকা, প্রভৃতি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্বে এই ধরনের কাজের প্রয়োজন বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়েছ। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে হাতের কাজ শিশুর পরিপূর্ণ মনোবিকাশের জন্য অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রথম পর্ব থেকেই ছবি-আঁকা, মাটির কাজ প্রভৃতি প্রবর্তনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। সোভিয়েট দেশের প্রাথমিক শ্রেণীতে, পড়ার সঙ্গে ছবি আঁকার পদ্ধতি বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি এটি শান্তিনিকেতনেও প্রবর্তন করতে চান।

সমাজ সেবা ও পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্ম :

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামাজিক গুণেরও বিকাশ সাধন করা। এই সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা আধুনিক শিক্ষানীতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথ নানাধরনের সামাজিক ও পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্ম শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'বিশ্বভারতী' (পৃঃ ১৪৯) পুস্তকে বলেছেন,—

"সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীত বাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন 'সমস্ত বিষয়েরই' সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়।"

দেশভ্রমণ :

'ডাকঘরের' অমল বলেছিল—'আমি পণ্ডিত হবো না পিসেমশায়, আমি শুধু দেখবো,—কেবলই দেখে বেড়াবো।' স্বদেশের সঙ্গে, স্বজাতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র শিক্ষা-বিধিতে ভ্রমণের একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ অনেকস্থানে স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নলিখিত মতামত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"চোখে দেখে শেখার আর একটি প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। তোমরা তো জানই আমি অনেকদিন থেকেই ভ্রমণ-বিদ্যালয়ের সংকল্প বহন করে এনেছি। ভারতবর্ষ এত বড়ো দেশ। সকল বিষয়েই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হণ্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। এক সময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। শুধু মাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য করে পাঁচবছর ধরে ছাত্রদের যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তাদের শিক্ষা পাকা হয়।" (রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ৬৯)

ম্যুজিয়ম পরিদর্শন ঃ

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন করে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুসি হন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন শিক্ষাকে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করবার জন্য কি প্রকাণ্ড প্রচেষ্টা চলেছে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে (পৃঃ ৫২) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে 'ম্যুজিয়ম'। নানা প্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে।"

বিদ্যালয়ে বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক 'ম্যুজিয়মে'র প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ উক্ত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। **ছবির ম্যুজিয়ম** বা Picture Gallery-র কথা তিনি বিশেষভাবে বলেছেন। ছাত্রছাত্রীদের মনে আর্টের বোধ জাগানোর জন্য ছবির ম্যুজিয়ম পরিদর্শন একটি আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে সর্বত্র গ্রাহ্য। এই প্রকারের ম্যুজিয়মের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের মনে আর্টের বোধ জাগিয়ে তোলা হবে। চিত্রবস্তুর সংস্থান (Composition), তার বর্ণ কল্পনা (Colour Scheme), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (Space), তার উজ্জ্বলতা (Illuminatión), যাতে ক'রে তার বিশেষ-সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (Technique), এই সকল বিষয় ছবির ম্যুজিয়মের মারফৎ শেখানো যেতে পারে।" (রাশিয়ার চিঠি)

শিশুশিক্ষার জন্য অন্য একটি বিশেষ ধরনের ম্যুজিয়মের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। শিশু-বিদ্যালয়ে **খেলনার ম্যুজিয়ম** প্রতিষ্ঠা শিশুদের শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করবার অন্যতম উপায়। এই খেলনার ম্যুজিয়ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন—ছেলেমেয়েদের দিয়ে খেলনা সংগ্রহ করে এই ধরনের ম্যুজিয়মে রাখা যেতে পারে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি দেশ-বিদেশের পুতুল ও খেলনা এইরূপ ম্যুজিয়মের জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।[৬]

৬। একটা কথা মনে পড়ল। এদের এখানে খেলনার ম্যুজিয়ম আছে। এই খেলনা-সংগ্রহের সংকল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরছে। তোমাদের

'ম্যুজিয়মের' সাহায্যে কী ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে—এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আপনার মতামত কিছু প্রকাশ করেছেন। এই ম্যুজিয়ামের সাহায্যে আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। কারণ আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমতো বোঝা অসাধ্য। প্রথম শিক্ষার্থীরা দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ম্যুজিয়মের বিভিন্ন সংগ্রহ (ছবিই হোক আর অন্যান্য ধরনের শিল্পবস্তুই হোক) সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানতে ছাত্রদের চেষ্টা করা উচিত। ম্যুজিয়মের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করা ছাড়াও শিক্ষকের আরও কর্তব্য রয়েছে। বিভিন্ন ছবি বা শিল্পের একটি শ্রেণীগত রীতি আছে। শিক্ষকের কর্তব্য একটি বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশী হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশী হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে, সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয়; ছবির রূপের সঙ্গে বিষয়ের ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর-বৈপরীত্য দ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্তু ছাত্রদের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি দেওয়া চাই।[৭]

শিল্প সম্পর্কে ছাত্রদের উৎসাহ ও আগ্রহ জাগাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি বিষয়ের কথা বলেছেন। মধ্যে মধ্যে খ্যাতনামা কোন শিল্পীর দ্বারা ছাত্রদের নিকট শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করানো যেতে পরে।

ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব পত্রিকা এবং দেয়াল-সংবাদপত্র প্রকাশ :

শিক্ষার দ্বারা শিশুদের সুষ্ঠু মনোবিকাশের জন্য লব্ধবিদ্যা উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা

নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভ হল। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েছি। অনেকটা আমাদেরই মতো। (রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ৭৪)

৭। রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ৫৫

পত্রিকা প্রকাশ করিয়ে এই সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এই পত্রিকার সমস্ত রচনা ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং এর সম্পাদনার সমস্ত দায়িত্বও তারা গ্রহণ করবে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা একে নানাবিধ অঙ্কনের দ্বারা সচিত্র করবে।

সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করানো ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা দেয়াল-সংবাদপত্র (Wall News Paper) প্রকাশ করানো যেতে পারে।

কিন্তু এই সংবাদপত্র প্রকাশকে আরও আনন্দদায়ক ও শিক্ষা-মূলক করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা 'সজীব সংবাদপত্র' চালাবার কথা বলেছেন। সজীব সংবাদপত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—সজীব খবরের কাগজটা অভিনয়ের মতো; নেচে গেয়ে ছাত্রছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন বিষয়কে সকলের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরবে। এই সজীব সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশের সংবাদ ছাড়া অন্য দেশের বিবরণও প্রচার করা যেতে পারে।[৮]

রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষাকে আনন্দদায়ক এবং গঠনমূলক কর্মের মাধ্যমে প্রদানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'শিশু-মনস্তত্ত্বের' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, শিশুমনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কেন্দ্র করে তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন। শিশুমনের এই প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে স্বাধীনতা, প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা এবং স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দদায়ক কর্ম (Spontaneous Joyful Activity) সম্পাদনের ইচ্ছা। শান্তিনিকেতনের মুক্ত অঙ্গনে তিনি শিশুদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেন নি। যে ধরনের কাজে শিশু আনন্দ পেতে পারে এবং যে সকল কাজ একটি গঠনমূলক (Constructive) লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

৮। সোভিয়েট দেশে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সজীব সংবাদপত্র অভিনয় দেখে খুসি হন। 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে সজীব সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত দেওয়া হল। রাশিয়ার চিঠিতে (পৃঃ ৪৭) তিনি লিখেছেন—"মনে করছি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্কুলে সজীব সংবাদপত্র চালাবার চেষ্টা করব।"

তাকেই তিনি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় স্থান দিয়েছেন। ডাঃ মন্তেসরী ও ফ্রোয়েবল-এর সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে কিছু পার্থক্য আছে। তাঁদের মত তিনি কোন বিশেষ যন্ত্র (Apparatus) আবিষ্কার করেন নি। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতেও কর্মের একটি মুখ্য স্থান আছে। কিন্তু ঐ কর্মের লক্ষ্য একটি বিশেষ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঐরূপ একটি বিশেষ লক্ষ্যবিশিষ্ট কর্মকে তিনি তাঁর পরিকল্পনায় স্থান দিতে পারেন নি। এইরূপ নির্বাচন যে তাঁর জীবনদর্শনের অনুকূল এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

উপরের আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত কর্মের আলোচনা করেছেন, তার উল্লেখ করেছি। ঐ কর্মসমূহের প্রকৃতি আরও গভীরভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন। তাঁর আলোচিত কর্মসমূহকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) যে সকল কর্মের সাহায্যে শিশু বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে পারে। যথা,—বস্তু সংগ্রহ, জীবজন্তু পালন, বৃক্ষ রোপণ, উদ্যান তৈয়ারী, ভ্রমণ, ম্যুজিয়াম পরিদর্শন, চড়িভাতি ইত্যাদি।

(২) যে সকল কর্মের মাধ্যমে শিশু বাস্তবের সঙ্গে পরোক্ষ-ভাবে সংযোগ রাখতে পারে। যথা,—নাটক রচনা, অভিনয়, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ইত্যাদি।

(৩) সামাজিক গঠনমূলক কার্য।

যথা,—পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্ম, সেবাশুশ্রূষার কাজ, ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা ইত্যাদি।

(৪) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশের উপযোগী কর্ম।

যথা,—বিভিন্ন খেলা, কারুকার্য ও শিল্পকলা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, সাহিত্য রচনা, পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশ ইত্যাদি।

কর্মের সাহায্যে 'শিক্ষা প্রণালী' রচনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যে জিনিসটার উপর জোর দিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে 'শিক্ষা হবে

প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ' এবং প্রকৃতির সাহচর্যে বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট থেকে শিশু শিক্ষালাভ করবে এবং জ্ঞান শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশ স্বরূপ হবে। 'পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা'র সাহায্যে প্রকৃতির নিকট থেকে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করবে।

জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অন্তর্ভূ'ত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। এই পদ্ধতি তিনি 'শান্তিনিকেতনে' প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এই পদ্ধতির তিনি নামকরণ করেছেন—**স্থানিক তথ্যসন্ধান** (Region Study)।

এই পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রেরা উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কোন বিশেষ স্থানের (Region) অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান করবে। তা ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে জমির উৎপাদিকা শক্তি কী শ্রেণীর, কিংবা কোন খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কি না, তার খোঁজ করবে। এই ধরনের সন্ধানে দেশের ম্যুজিয়মের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে দেশের সঙ্গে পরিচয় না হলে ছাত্রদের জ্ঞানোন্নতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সাধারণতঃ ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি সেই জ্ঞানই শিক্ষার্থীর বুনিয়াদী জ্ঞান (Key Knowledge)। শিক্ষার্থীর নিকট এই বুনিয়াদী জ্ঞানের প্রয়োজন খুব বেশি। কারণ, এই জ্ঞানের সঙ্গে অন্যভাবে লব্ধজ্ঞান যাচাই করে তারা সত্যজ্ঞানকে বাছাই করে নিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি'তে (পৃঃ ৫৩) লিখেছেন,—

"এই রকম নিকটবর্তী স্থানের তথ্যানুসন্ধান শান্তিনিকেতনে কালীমোহন কিছু পরিমাণে করেছেন। কিন্তু এই কাজের সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোনো উপকার হয় নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করার মন তৈরি করা কম কথা নয়। কলেজ-বিভাগের ইকনমিক্স ক্লাসের

ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এই রকম চর্চার পত্তন করেছেন শুনেছিলুম; কিন্তু এ কাজটা আরো বেশি সাধারণ ভাবে করা দরকার, পাঠভবনের ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই, আর এই সঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।"

প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ সবল হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা। তারপরে মনের শিক্ষা এবং তারপরে বোধের শিক্ষা। তিনটি স্তরই ধারাবাহিক এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য 'বোধ বা উপলব্ধি'-র শিক্ষাই প্রধান।

মন এবং বোধকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত করবার জন্য 'স্থানিক তথ্যসন্ধান পদ্ধতি' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই পদ্ধতির আমরা নামকরণ করতে পারি **তুলনাত্মক পদ্ধতি বা Comparative Method.**

'তুলনাত্মক পদ্ধতির' মূল লক্ষ্য এই যে, আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। আমাদের কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করে শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। বই থেকে আমরা যে জ্ঞান পাই তা আমাদের আপনার জ্ঞান নয়। এই জ্ঞানকে নিজের করে নিতে হলে ছাত্রদের বইএর বিদ্যা বিশেষভাবে বিচার করে, যাচাই করে, মিলিয়ে নেবার প্রয়োজন। এই পদ্ধতির মূল নীতি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে বলেছেন—আমাদের শিক্ষা নিকট থেকে দূরে এবং পরিচিত থেকে অপরিচিতের দিকে গেলেই তার ভিত্তি পাকা হতে পারে। পরিচিত বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে শিখলে তবেই যা অপ্রত্যক্ষ, যা অপরিচিত, তাকে গ্রহণ করবার শক্তি জন্মে।

এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি **ইতিহাস-শিক্ষা**[৯] সম্বন্ধে বলেছেন,—

"আমাদের ইতিহাসের জ্ঞানকে জাতীয় ইতিহাস-সংগ্রহের সঙ্গে মিলাইয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন।

"আমরা ইতিহাস পড়ি,—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানাস্থানে অপ্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিষ তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতে পারে না।" (শিক্ষা—পৃঃ ২১)

আমাদের স্কুল কলেজে যে **ভাষাতত্ত্ব** আলোচনা করা হয় তা সাধারণতঃ হয় বিদেশী ভাষাকে কেন্দ্র করে। 'ভাষাতত্ত্ব' সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মাতৃভাষার সঙ্গে তুলনা করে গ্রহণ করতে হবে।

"আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই, ভাষার রহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।" (শিক্ষা—পৃঃ ২১)

আমাদের **সমাজ ও ধর্মের** জ্ঞান সম্পূর্ণ করবার জন্য আমাদের দেশের সমাজ ও ধর্মের বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লব্ধজ্ঞান বিচার করে গ্রহণ করতে হবে।

"এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থা বৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধান-পূর্বক, অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনো হইতেই পারে না।" (শিক্ষা—পৃঃ ২১)

৯। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং বিন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে যেরূপ, নৃতত্ত্ব বা Ethnology সম্পর্কেও সেইরূপ আমাদের অর্জিত জ্ঞান ভারতীয় বিভিন্ন জাতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে তুলনা করে গ্রহণ করবার প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"আমরা নৃতত্ত্ব বা Ethnology বই যে পড়ি না তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কত তুচ্ছ বলিয়া জানি।" (শিক্ষা—পৃঃ ২৫)

দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তথ্য সংগ্রহ করবার ব্যাপারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট কাজ করবার আছে। এই সংগ্রহ ও আলোচনার ভিতর দিয়েই দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষিত মনের পরিচয় স্থাপিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে।" (শিক্ষা—পৃঃ ২৫)

এই ভাবে 'তুলনাত্মক পদ্ধতির' সাহায্যে আমাদের অধীত বিদ্যাকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করবার প্রণালী যে শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্মত এতে কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতি ব্যবহারের সপক্ষে নিম্নলিখিত কারণে মত প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হয়ে উঠে এবং নিজের চারিদিকে নিজের দেশকে ভালো করে

জানবার অভ্যাস হলে অন্য সমস্ত জানবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, নিজের দেশকে ভাল করে জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে ভালবাসার অঙ্গ। এইরূপ শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

শিশুর শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির উপর নির্ভর করলেও, পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য শুধুমাত্র বাহ্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে চাননি। দেশের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গেও শিক্ষার্থীর যোগস্থাপন করতে চেয়েছেন। এই কাজ পুঁথির সাহায্যে উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারাই সম্ভব। এই জন্য রবীন্দ্র শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের স্থান প্রধান।

ক্লাসে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের প্রণালী সম্পর্কে তিনি কোন বিশেষ পদ্ধতি আলোচনা করেন নি। কিন্তু তিনি নিজে শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয় পাঠ নিতেন। সেখানে তিনি আলোচিত বিষয় যাতে শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পারে এরূপ পদ্ধতির সাহায্যে ক্লাসে পাঠ আলোচনা করতেন। সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' পুস্তকে লিখেছেন,—

"তাঁহার নিয়ম ছিল, প্রশ্ন করিয়া করিয়া বালকদের মুখ দিয়া ঠিক শব্দটি বাহির করিয়া লইতেন,—ইহাতে তাঁহার শ্রান্তি বা অসন্তোষ দেখি নাই। বালকেরা প্রশ্নের ইঙ্গিত ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে নিজেদের শক্তি আবিষ্কার করিত। আত্মশক্তির আবিষ্করণই শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[১০]

এই ধরণের শিক্ষাপদ্ধতিতে যেখানে শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়—আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে উক্ত পদ্ধতিকে বলা হয় হিউরিস্টিক পদ্ধতি (Heuristic Method)[১১]। রবীন্দ্রনাথ

১০। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন।

১১। The heuristic method is dominated by the thought that the general attitude of the pupil is to be that of a dis-

ক্লাসে শিক্ষাদানের জন্য উক্ত হিউরিস্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, কারণ তিনি শিক্ষার্থীর বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

আমাদের যেমন শারীরিক বিকাশের জন্য শরীর-চর্চার প্রয়োজন, তেমনি মনোবিকাশের জন্য মনের শক্তির অনুশীলন প্রয়োজন। শিক্ষাবিদগণ বলেন—শিক্ষার্থীকে নানাপ্রকার সমস্যামূলক অবস্থার মধ্যে ফেলে তার মনোবিকাশে সাহায্য করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে শিক্ষকের যেমন বিশেষ দায়িত্ব আছে, তেমনি শিক্ষার্থীরও শিক্ষা গ্রহণের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকেও সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে এই শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কারণ একমাত্র নিরলস সাধনার সাহায্যেই আমাদের প্রকৃত শিক্ষালাভ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"শুধুমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না। বহুবিধ বিষয় পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে। মানুষ যে বাড়ে সে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি।" (শিক্ষা—পৃঃ ৬৭)

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 'রবীন্দ্র শিক্ষাপদ্ধতির' মূলনীতি নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। শিক্ষাদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ কোন নির্দিষ্ট সূত্রের (Formula) উল্লেখ করেন নি। কয়েকটি সাধারণ নীতির মাত্র

---

coverer, not that of a passive recipient of knowledge. The pupil is expected in a sense to rediscover the subject, though not without profit from the fact that the race had already discovered it. ... It is the function of the teacher and of the text so to present the things to be done, so to propose the problems to be solved that they require real discovery on the part of the pupil; that at the same time the steps are within his power, and that he attains in the end a good view of the whole subject.

The Teaching of Mathematics : J. W. A. Young, Page 69

উল্লেখ করেছেন। তিনি চেয়েছেন যে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নিজের শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন করবেন। শিক্ষালাভের জন্য যেমন শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের স্বাধীনতা। শিক্ষককে পদ্ধতির বেড়াজালে আটকে রেখে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে এইটি আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান দান।

পাঠ্যবিষয় প্রসঙ্গে

"প্রত্যেক দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগলাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতাসাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি।" বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োজনও এই কারণে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞান ও দক্ষতা আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে সম্পূর্ণভাবে পেতে পারি না। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য অন্য সাহায্য দরকার। এইজন্য যেমন দরকার শিক্ষকের সাহায্য তেমনি দরকার উপযুক্ত পুস্তকের সাহায্য।[১] পুস্তকের সাহায্যে আমরা নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে, বিভিন্ন দেশের মনীষীদের চিন্তার সঙ্গে এবং স্বদেশের এবং বিদেশের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের যোগ স্থাপন করতে পারি। পুস্তক আজ আধুনিক সভ্যতার প্রধান বাহক এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বই দিয়ে মানুষ অতীতকে বর্তমানের মধ্যে বন্দী করেছে; অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল একখানি বই দিয়ে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে। 'মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে।'[২]

১। May books and Nature be their early joy !
And knowledge, rightly honoured with that name—
Knowledge not purchased with the loss of power.
Wordsworth—*The Prelude*

২। বিচিত্র প্রবন্ধ—পৃঃ ১

শিক্ষার লক্ষ্য মানবমনের উৎকর্ষ সাধন করা। বিশ্বমানবের সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্র-মনের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে বিদ্যালয় এই উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে। আমরা বলেছি পুঁথিই এই সংস্কৃতির প্রধান বাহন।

এই সংস্কৃতির সংজ্ঞা কি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"যা'কে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণমূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা; মন যেখানে সুস্থসবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।"[৩]

বিদ্যালয়ের কাজ শিক্ষার্থীর সঙ্গে মানব-সংস্কৃতির পরিচয় ঘটানো। তবে এই সংস্কৃতির রূপ দেশকাল ভেদে বিভিন্ন। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পার্থক্য আছে নানা দিক দিয়ে। আজ য়ুরোপ তার আপন সংস্কৃতির চর্চা করছে ব্যাপকভাবে। য়ুরোপ যদিও বিজ্ঞানের অনুশীলনের দিকে বেশী জোর দিয়েছে, তবুও সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়গুলিকে তাচ্ছিল্য করেনি। তবে য়ুরোপ য়ুরোপের মত করে তার সংস্কৃতির চর্চা করছে। ভারতবর্ষকেও তার নিজের মত করে সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই বিশ্ব-সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি পত্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবল মাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল

৩। বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৪৮

তেমনি যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রম সাধনায়—এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।”[৪]

‘পাঠ্যবিষয় ও পাঠক্রম’ নির্দেশের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ নীতির উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে এই যে শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ থাকা চাই। মানব-সংস্কৃতির যে বিষয়গুলি মানব মনে প্রেরণা দিতে পারে তাকেই তিনি তাঁর বিদ্যালয় পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভূর্ত করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেই সমস্ত প্রবন্ধের ভিত্তিতেই পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্যটি বিশেষ করে মনে রাখলে আমরা রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রধান গতিপথ সম্পর্কে কিছু ধারণা করতে পারব—তা হচ্ছে এই,—

“এখানে আমরা ছাত্রদের কোন বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মত হচ্ছে কিনা,……এই সমস্ত যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এ সমস্ত আজ আছে কাল না থাকতেও পারে।”[৫]

অর্থাৎ পাঠ্যবিষয় নির্বাচন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পরিবর্তনশীল নীতির উল্লেখ করেছেন। তবে যে মূল নীতির কথা তিনি সর্বত্র উল্লেখ করেছেন—তা হচ্ছে যে পাঠ্যবিষয়ে ‘মনের প্রাণীন পদার্থ’ থাকা চাই।

বিদ্যালয়কে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে মানব-সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসাবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের আলোচনার ধারা অনুসরণ করে আমরা **সংস্কৃতি**-কে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

৪। বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৪৯, ৫। বিশ্বভারতী—পৃঃ ১০৭

মানব-সংস্কৃতি	**ভাষা**—	সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান
	কলা (আর্ট)—	শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য
	সমাজ-সেবা—	পল্লী উন্নয়নমূলক ও সামাজিক অন্যান্য কর্ম।

বিদ্যালয়ে উক্ত বিষয় সমূহের স্থান নির্দেশের জন্য বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি কোন একটি বিষয়কে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূ্ত করে উহার সপক্ষে মতামত দিয়েছেন, অথবা বিভিন্ন বক্তৃতা, রচনা বা আলোচনার মাধ্যমে কোন বিষয়কে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করবার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনে **সাহিত্যের** স্থান প্রধান। তার কারণ বোধ হয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থীর মন সঞ্জীবিত হয়। সুসাহিত্য 'মনের প্রানীন পদার্থে' সমৃদ্ধ। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই ভাষার সঙ্গে পরিচয় গভীর হয়। ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণত সে মিলন নিকটের ও প্রত্যহের। সাহিত্য এসেছে মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের মুখোমুখি করাবার কাজে। প্রাকৃত জগৎ সকল কালের সকল স্থানের সকল তথ্য নিয়ে, সাহিত্য জগৎ সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের কল্পনা-প্রবণ মন নিয়ে।"[৬]

রবীন্দ্র শিক্ষা-পরিকল্পনায় 'সাহিত্যের' স্থান প্রধান হয়েছে, তার কারণ কবি নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের শক্তি বিশেষ-

৬। রবীন্দ্র রচনাবলী, (২৬শ খণ্ড—বাঙ্গালা ভাষা পরিচয়)—পৃঃ ৪০।

ভাবে লক্ষ্য করেছেন। পরস্পরের সঙ্গে মিলন ঘটাতে সাহিত্যের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। সাহিত্যের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষের মনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারি অতি সহজেই,—ধর্মের ব্যবধান, রাজনীতির ব্যবধান, জাতীয়তার ব্যবধান এই সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। শিক্ষার জন্য দেশের বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে দেশের ও বিদেশের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের পরিচয় স্থাপনের। এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য সাহিত্যের চেয়ে শক্তিশালী আর কি বিষয় আছে ?

বিষয় হিসাবে সাহিত্য ব্যাপক স্থান জুড়ে আছে আমাদের সমাজে। নানা ভিত্তিতে সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথও পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমরা সাহিত্যের নিম্নলিখিত ভাগটি উপস্থাপিত করছি। অবশ্য এই বিভাগটি 'শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের' উপযুক্ত। স্থান ভেদে, মাতৃভাষার রূপ ভেদে এই বিভাগের পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক।

সাহিত্য ঃ

(১) **মাতৃভাষা ঃ**—বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি।

(২) **অন্য ভারতীয় ভাষা ঃ**—হিন্দী, উর্দ্দু ইত্যাদি।

(৩) **পাশ্চাত্ত্য ভাষা ঃ**—ইংরাজী, ফরাসী ইত্যাদি।

(৪) **অন্য প্রাচ্য ভাষা ঃ**—চৈনিক, তিব্বতী ইত্যাদি।

(৫) **প্রাচীন ভাষা ঃ**—(ক) সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষা।
(খ) আরবী ও পার্শী ভাষা।

সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে পাঠক্রমের উল্লেখ করেছেন, তাতে তিনি মাতৃভাষার সঙ্গে দেশের প্রাচীন ভাষার স্থান যেমন রেখেছেন, তেমনি রেখেছেন বিশ্ব-সংস্কৃতির ধারক হিসাবে বিশ্বের

প্রধান ভাষার যোগ। এই সমস্তের যোগেই বিশ্ব-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ। তবে তাঁর পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে মাতৃভাষার স্থানই প্রধান।

মাতৃভাষা ঃ

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যতো উচ্চ কণ্ঠে নিজের মত ঘোষণা করেছেন আমাদের দেশে এমন আর কাউকে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন—'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। সুস্থ মানুষ যেমন উপযুক্ত বয়সে মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে, তেমনি, "আপন ভাষায় ব্যাপক-ভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তাঁর সুস্থ চিত্তের লক্ষণ।" ছোটবেলা থেকে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ না করলে চিত্ত প্রস্ফুটিত হয় না। এই বিষয়টি তিনি লক্ষ্য করেছেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি দেখেছেন যে বাংলাভাষার পথ দিয়ে নানা বিষয় তিনি শিখেছিলেন বলেই, ছোটবেলা থেকেই মন তার সজীব হয়ে উঠেছিল। "মনের চিন্তা ও ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য-সাধনই সুস্থপ্রাণের লক্ষণ।"

কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের মন সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমাদের নষ্ট হয়েছে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে। এর ফলে শিক্ষার যে প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন করা—তা একেবারেই হয় না। কারণ বিদ্যালয়ে বহু চেষ্টায় যে অল্প ইংরাজী জ্ঞান আমরা অর্জন করি তার সাহায্যে আমাদের ভাবের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য ঘটে না। শিক্ষাকে পুঁথির পাতার অংশ হিসাবে আমরা গ্রহণ করি, জীবনযাত্রার অংশ হিসাবে আমরা দেখি না। বর্তমান শিক্ষার ব্যর্থতার ইহা যে অন্যতম প্রধান কারণ—এতে কোন সন্দেহ নাই।

এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে পাইত;

যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত—গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতি জননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা ; প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল।"[৭]

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমরা শিখি বলে আমাদের চিন্তার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যতা থাকে। অবশ্য বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা দোষের নয়। অন্য দেশও শিক্ষা করে। তবে,—"অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্য যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়।"[৮]

আমাদের দেশে শিক্ষার পূর্ণতার জন্য আমরা বিদেশীভাষা শিখি না। বিদেশীভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টাকেই আমরা শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছি। রবীন্দ্রনাথ এই নীতির বিরুদ্ধেই তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এই যুক্তির বশবর্তী হয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি বাংলা ভাষায় তাঁর অভিভাষণ দেন।

সকল শিক্ষার জন্য মাতৃভাষাকেই যে শিক্ষার বাহন করা উচিত,—এই নীতির বিরুদ্ধে আজ আর বোধ হয় বেশী লোক পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মাতৃভাষাকেই মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের পিছনে রবীন্দ্রনাথের অংশ যে অল্প নয় এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

এই ভাষা শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 'শিক্ষা হবে জীবনযাত্রার

৭। শিক্ষা—পৃঃ ৫, ৮। শিক্ষা—পৃঃ ৩২০

অঙ্গ।' সুতরাং শিশুর জীবন-বিকাশের সঙ্গে তার ভাষাবিকাশের যোগ স্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন পরিবেশ ও ঘটনার সংস্পর্শে এনে শিশুকে মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। শিশুর ভাব ও শব্দসম্পদ বৃদ্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাজের উল্লেখ করেছেন। যেমন,—(১) ছড়া আবৃত্তি করানো, (২) নানা-রকম খেলা ও কাজ, (৩) গল্প শোনা ও গল্প বলা, (৪) রামায়ণ-মহাভারতের গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, (৫) কবিতা শোনা ও আবৃত্তি করানো, (৬) শিশুদের নানা বিষয় সম্পর্কে মনের ভাব প্রকাশে উৎসাহ দেওয়া, (৭) অভিনয় ও গান করানো, (৮) বই পড়া ও বইএর বিষয় নিয়ে ছবি আঁকা প্রভৃতি।

এই সকল কাজের মারফৎ শিশুর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সৃষ্টি হবে। বই পড়ানোর পূর্বে শিশুকে নানাবিধ কাজ করতে দেওয়া উচিত। এই সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য ভাষা শিক্ষার জন্য শিশুকে প্রস্তুত করা। রবীন্দ্র শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করেছি।

শিশুকে ভাষা শিক্ষা দানের জন্য রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি বিশেষ ধরনের পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। এই সমস্ত পুস্তকের বিষয়বস্তু ও লিখবার পদ্ধতি আলোচনা করলে রবীন্দ্র শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ আমরা পেতে পারি। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। আনন্দ, কাজ ও শিক্ষা এই তিনের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত।

মাতৃভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমরা কিছু উল্লেখ করেছি। ভাষা শিক্ষার পরবর্তী স্তরে ব্যাকরণের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। বিশেষ করে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-রচনা সম্পর্কে তাঁর মতামত বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ ভাষা শিক্ষার অংশ হিসাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী। প্রথম

কয়েকটি স্তরে এই সম্পর্কে মতদ্বৈত না থাকলেও, ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য, গঠন পদ্ধতি অনুধাবনের জন্য একখানি বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন।

"মাতৃভাষার একখানি ব্যাকরণ রচনা সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।"

ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ আপন মতামত প্রকাশ করেছেন। ভাষার ঐতিহাসিক ধারা ও গঠন বুঝতে হলে ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। ভাষা শিক্ষার উন্নততর স্তরে পাঠ্য হিসাবে ভাষাতত্ত্বকেও অন্তর্ভূ্ত করা উচিত।

রামায়ণ ও মহাভারত ঃ

ভাষা শিক্ষার জন্য এবং জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ-মহাভারত'-কে একটি আলাদা বিষয় হিসাবে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। এই দুইখানি মহাকাব্যের প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে খুব ব্যাপক এবং ইহাদের শিক্ষাগত মূল্যও খুব বেশি। এই জন্য রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমরা পৃথক ভাবে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেছি।

এই দুই খানি মহাকাব্যের সঙ্গে শিশুমনের পরিচয় না ঘটলে শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। রামায়ণ-মহাভারত দুই ভাবে শিশুর মনোবিকাশে সাহায্য করে। প্রথমতঃ, রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে শিশুচিত্ত একটি জাতীয়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ, রামায়ণ-মহাভারতের অপূর্ব ঘটনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিশুর মন পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের জন্য একটি অনুকূল আবহাওয়া পায়। অনেকে বলতে পারেন—রামায়ণ-মহাভারত সুকঠিন কাব্য, আদৌ শিশুমনের উপযোগী নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে শিশুশিক্ষার জন্য অনুরূপ উপযুক্ত পুস্তক

বাংলা ভাষায় আর নেই এবং এই কারণ ছাড়াও তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিশুরা যতটুকু বুঝতে পারে তার চেয়ে কিছুটা বেশিই তাদের কাছে উপস্থাপনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কারণ,—"যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবলই তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে, যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।"[৯]

ভারতীয় শিশুদের উপযুক্ত মনোবিকাশের জন্য রামায়ণ-মহাভারত পাঠ অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশে শিশুশিক্ষার জন্য 'স্বাধীন পাঠ' হিসাবে রামায়ণ-মহাভারতের দাবি চিরকালের। অন্য কোন কাব্য বা পুস্তক রামায়ণ-মহাভারতের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। এই স্বাধীন পাঠের জন্য রামায়ণ-মহাভারতের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। "কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।"

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম অবস্থা থেকেই রবীন্দ্রনাথ আমদের শিক্ষাব্যবস্থার এই ক্রটি দূর করায় সচেষ্ট ছিলেন। ছেলেমেয়েদের আনন্দদানের জন্য, তাদের চিত্তকে সঞ্জীবিত করবার

৯। শিক্ষা—পৃঃ ১

জন্য তিনি সর্বদাই রামায়ণ-মহাভারতের সাহায্য নিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর কার্যপ্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য-করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তাছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটা ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম।··· এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছি।

"আমি জানি, ছেলেদের এমনি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খুব বড়ো কথা। মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এত বড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার।"[১০]

শান্তিনিকেতনের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় কিছু আলোচনা করেছেন। তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে শিশুকে অত্যন্ত বেশি শিশু এবং বয়স্ককে একেবারে সর্বজ্ঞ মনে করা হয়।···শান্তিনিকেতনের শিশুদের একান্তভাবে শিশু মনে করা হয় না। এখানকার নিম্নতর শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা লক্ষ্য করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই সব বই কলেজের উচ্চতম শ্রেণীতে দিতেও অনেকে সঙ্কোচ বোধ করিবেন।"

পাঠক্রম সম্পর্কে অধ্যাপক বিশী মহাশয় বলেছেন,—

"রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্য দিয়ে পাঠ আরম্ভ হয়। শ্রেণীটি অক্ষর পরিচয়ের ঠিক উপরের ধাপ।······ সব চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য এই যে অল্পবয়সে 'জোড় করি হাত করি প্রণিপাত' জাতীয় কবিতা পড়িবার সুযোগ হয় নাই।

১০। বিশ্বভারতী—পৃঃ ৫১

"দ্বিতীয় পুস্তক ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের মহাভারত'। শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই রামায়ণ-মহাভারত ও রবীন্দ্র কাব্যের উপর প্রতিষ্ঠা পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষার সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, বালকদের স্কুলপাঠ্য ও অতিরিক্ত পাঠ্যের তালিকায় রামায়ণ-মহাভারতের স্থান নাই বলিলেও চলে। ফলে বাংলা দেশের বালকচিত্ত ত্রিশঙ্কুর মতো প্রতিষ্ঠাহীন হইয়া বায়ুভূত নিরাশ্রয়ে দোদুল্যমান।"[১১]

প্রাচীন ভাষা ও বিশ্বভাষা

পাঠ্যতালিকায় মাতৃভাষা ও রামায়ণ-মহাভারতের স্থান সম্পর্কে আমরা রবীন্দ্রনাথের মতামত আলোচনা করেছি। শিক্ষার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে প্রধান স্থান দিলেও অন্য ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেননি। এই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য, বিশ্বমানবের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য আমাদের ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা শিখতে হবে। আমাদের বিদ্যাক্ষেত্রকে পূর্ব পশ্চিমের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

"মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতেই সর্ব-মানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী। তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্তসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেই চিত্ত সাগর তীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত।"[১২]

১১। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—পৃঃ ২২, ১২। বিশ্বভারতী—পৃঃ ১২৩

সুতরাং বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং অন্য বিদ্যার সঙ্গে জাতীয় বিদ্যার তুলনার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে ইংরাজী প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষার সঙ্গে চীনা ভাষা, তিব্বতী ভাষা প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার চর্চা করতে হবে। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বলেছেন,—

"আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।...

"তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-প্রশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই।

"অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে, বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্শিবিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।"[১৩]

সংস্কৃত ভাষা

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের পরিচয় ঘটাতে চেয়েছেন। এই জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতির যেমন একটি বিশেষ অংশ আছে, তেমনি আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতির। "বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহমনে শিক্ষা বিস্তার করে।" কিন্তু এ হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতি। কিন্তু শিক্ষার্থীর সঙ্গে দেশের অন্তঃপ্রকৃতির বিশেষ পরিচয় স্থাপন দরকার। "দেশের যে অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে।" দেশের এই অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে কি ভাবে আমরা সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব,

১৩। বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৭৫

তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।”[১৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী ‘বিশ্বভারতী’কে বিশ্ববিদ্যার সমবায় ক্ষেত্ররূপে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছিলেন দেশের ও বিদেশের বহু গুণিজনকে। এই প্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় (১৮ই আষাঢ়, ১৩২৬) তিনি বলেছেন,—

“আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহন বাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মশায়। ওদিকে এণ্ড্রুজের চারিদিকে ইংরেজি-সাহিত্য পিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন।······ আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন ও ক্ষিতিমোহন বাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দি-সাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।”[১৫]

দর্শন ও বিজ্ঞান

ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমরা আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে দার্শনিক ও কবি। সুতরাং শিক্ষার্থীর

১৪। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ৪৫, ১৫। বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৮

চিন্তার সুস্পষ্টতার জন্য দর্শন-পাঠের প্রয়োজন তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন। দর্শনের সাহায্যে জাতির অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মানব-সংস্কৃতিতেও দর্শন একটা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।

বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমরা 'শিক্ষার লক্ষ্য' আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। বহির্বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেছেন। কারণ,—

"সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবন রক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়। জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে।"

য়ুরোপ এই বিজ্ঞানের বিদ্যার সাহায্যে বিশ্ব জয় করেছে। আবার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণও করেছে। বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেন না বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেন না বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে।[১৬]

বিজ্ঞানশাস্ত্র বহু বিচিত্র। গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physical Sciences), সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences) প্রভৃতি অংশে বিজ্ঞানকে ভাগ করা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বস্তু ও প্রাণের নিয়ম আবিষ্কারে মানুষকে সাহায্য করে। তেমনি আছে সামাজিক বিজ্ঞান,—ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব (Sociology)-এর অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞানপাঠের যৌক্তিকতা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মতামত বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম ও প্রকৃতি বৈদেশিক স্বার্থের প্রভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞান এই

১৬। বিশ্বভারতী—পৃঃ ১০৫

প্রভাবের ফলে বিকৃত হতে পারে। অভিসন্ধিপূর্ণ ইতিহাসের মারফৎ কোনো জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়। ভূগোলের সাহায্যে ঔপনিবেশিকতাকে সমর্থন করা যায়, অর্থনীতিকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থীরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাসের মধ্যে দেশের প্রকৃত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এই প্রকৃত ইতিহাস শুধুমাত্র মারামারি কাটাকাটির ইতিহাস বা রাজারাজড়ার ইতিহাস মাত্র নয়, এই ইতিহাস ভারতবর্ষের মানুষের সুখ দুঃখ, উত্থান পতন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করবে।

"যে সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়; বালককালে ইতিহাসই দেশের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়।"[১৭]

আমাদের দেশে নানা কারণে এর ঠিক উলটোটিই হয়েছে। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কারণ,—

"ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া, ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ ভাব জন্মে।"[১৮]

বিদেশী-লিখিত ইতিহাসে স্বদেশের সত্য রূপটি থাকে না। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস রচনা, ইতিহাস পাঠ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার গবেষণা সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের আপন সার্থকতাকে ইতিহাসের দ্বারা ঘোষণা করতে হবে। সেই 'সার্থকতাটি' কি?—

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি,—প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে

১৭। ইতিহাস—পৃঃ ৩, ১৮। ইতিহাস—পৃঃ ৫

অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[১৯]

আমরা রবীন্দ্র জীবন-দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, জীবনের নানা ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ দ্বান্দ্বিক মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাসের ধারা নির্ণয়েও তিনি ঐ মতবাদ প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন,—

"সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের পালা আছে; একবার ভিতরের দিকে একবার বাহিরের দিকে নামা-উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে। থামা ও চলার অবিরত যোগেই বিশ্বের গতিক্রিয়া সম্পাদিত।"[২০]

ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতির রূপটি বুঝতে হলে, ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের সংঘাতের ধারাটিকে আবিষ্কার করতে হবে। ইতিহাসের এই সংঘাতটিকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন,—

"একদিকে আত্ম একদিকে পর, একদিকে অর্জন একদিকে বর্জন; একদিকে সংযম একদিকে স্বাধীনতা, একদিকে আচার একদিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই তাল-অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনার ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।"[২১]

আমাদের প্রাচীন মহাকাব্য দু'খানি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক রূপটির প্রকৃতি সন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন। কারণ ঐ প্রাচীন মহাকাব্য দুইখানিতে এই দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট।

"গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজ বিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ।" সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান অর্জনের জন্য রামায়ণ-মহাভারত পাঠের প্রয়োজন।

১৯। ইতিহাস—পৃঃ ৬, ২০। ইতিহাস—পৃঃ ১২, ২১। ইতিহাস—পৃঃ ৩৪

আজও সমাজের ভিতরকার দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হয়নি। এতকাল আমরা বিদেশীর চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করে দেখেছি। এতকাল আমরা পাঠান রাজত্বের ইতিহাস, মোঘল রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করতাম। এখন আমরা সেই মোগল রাজত্ব পাঠান রাজত্বের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসরণ করতে চাই। এই ইতিহাস রচনা আমাদেরই করতে হবে। এই রচনায় লেখকের যেমন দক্ষতা আবশ্যক, তেমনি দরকার বিচার ও গবেষণার সঙ্গে কল্পনা ও সহানুভূতি।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীদের নিকট উপস্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ-পদ্ধতির (Analytic Method) সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য-ভারতবর্ষ, মুসলমান-ভারতবর্ষ এবং ইংরাজ-ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিসটা কী। এমন কি আমরা বলি, ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথক ভাবে ও তন্ন তন্ন রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে।"[২২]

বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ব্যাপারটির বৈশিষ্ট্য এই যে প্রথমে ইতিহাসের সমগ্র রূপটি ছাত্রছাত্রীদের নিকট সহজ ভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং তারপর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিষ্কার করে উপলব্ধি করবার জন্য ছাত্রদের সাহায্য করা হয়। পরে যখন অন্য কোন নূতন বিষয় ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত হয়, তখন তারা ইতিহাসের সমগ্ররূপের সঙ্গে বিভিন্ন অংশের যোগটি সহজেই ধরতে পারে।

২২। ইতিহাস—পৃঃ ১৫৬

ইতিহাসের প্রকৃত রূপটির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটানোর প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন। এই পরিচয়ের ফলে জনসাধারণের পক্ষে স্বদেশের প্রকৃত স্থানটি ঠিক করে বুঝবার সুবিধা হয়। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতির আলোচনা করেছেন।

কথকতা ও যাত্রার সাহায্যে ইতিহাসের বিষয়বস্তু শিক্ষা দান

জাতীয় ইতিহাসের বিষয়বস্তু কথকতা ও যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণের কাছে সরস করে উপস্থিত করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার চেয়ে এই প্রণালীর সাহায্যে ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা আরও সুন্দর ও সুষ্ঠু হতে পারে। এই প্রণালীর সাহায্যে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাও যুক্ত হয় এবং জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করে তোলা সম্ভব হয়। এই জন্য ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে, স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করে রচনা করা দরকার।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক ইতিহাস-শিক্ষার অন্যতম প্রকৃষ্ট উপকরণ বলে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন।

কলাবিদ্যা[২৩]

জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ দেশের সংস্কৃতির বিচিত্রধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের সংযোগ স্থাপন করা। শুধু মাত্র পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে এই সংস্কৃতির সীমা নির্দেশ করলে 'শিক্ষার লক্ষ্য'কে সংকীর্ণ করা হয়। সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীত-বাদ্য, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি এই সংস্কৃতির অংশ হিসাবে আমাদের বিদ্যায়তনে পূর্ণ মূল্য পেতে পারে। কারণ শিক্ষার্থীর চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এই সমস্তেরই প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে কলাবিদ্যার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কলাশিল্পের চর্চার দ্বারা শিক্ষার্থীর তত্ত্ববোধ ও রসবোধের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন হয়,

২৩। নন্দলাল বসুর 'শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তবে কলাচর্চার স্থান ও মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত।

শাস্ত্রে ৬৪ প্রকার কলার উল্লেখ আছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগই এর অন্তর্গত। আলোচনার সুবিধার জন্য কলাবিদ্যাকে আমরা তিনটি অংশে ভাগ করেছি—শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্য।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হতেই নানাজাতির নানাধর্মের নানাচিত্তের সম্মিলনে যে সৃষ্টির কাজ চলেছে ভারতের শিল্পকলায় স্থপতি বিজ্ঞানে তার নিদর্শন রয়েছে। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী সংস্কৃতির এই দিকটিকে বিশেষভাবে অবহেলা করেছে। তার কারণ আমাদের শিক্ষার ভিত্তি জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং শিক্ষার লক্ষ্যও ছিল সীমাবদ্ধ।

শিল্পচর্চার দুটি দিক আছে। একটি আনন্দ ও জ্ঞানের দিক অর্থাৎ 'চারুশিল্প,' অন্যটি জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক মান উন্নত করার দিক অর্থাৎ 'কারুশিল্প'। চারুশিল্পের চর্চার দ্বারা আমরা বিশ্বমানবের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমাদের মনের যোগ স্থাপন করতে পারি, আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সঙ্কুচিত মনকে আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। কারুশিল্পের সাহায্যে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসকে সুন্দর করে ভোগ করতে পারি।

বিদ্যালয়ে উভয় প্রকার শিল্পচর্চারই স্থান থাকা উচিত।

শিল্পশিক্ষারও দুটি দিক আছে। প্রথমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিখ্যাত শিল্পীগণের সৃষ্টির সঙ্গে ছাত্রমনের সংযোগস্থাপন এবং উপযুক্ত শিল্পরসিক ব্যক্তির সাহায্যে উৎকৃষ্ট শিল্পের বিভিন্ন গুণের আলোচনা করে ছাত্রদের বুঝতে সাহায্য করা; দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে অঙ্কনপদ্ধতি আয়ত্ত করা। প্রথমটির সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিল্পবোধ জাগ্রত হয় এবং দ্বিতীয়টির সাহায্যে শিক্ষার্থীর দক্ষতালাভ হয়।

বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যকে অনুভব করবার জন্য এবং উচ্চশ্রেণীর শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে, গ্রন্থাগারে, পড়ার ঘরে এবং বাসগৃহে ভাল ভাল ছবি, ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন চারু ও কারুশিল্পের নিদর্শন রেখে ছাত্রছাত্রীদের শিল্পবোধ জাগ্রত করা যেতে পারে।

শিল্প সম্পর্কে সহজবোধ্য পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা ছাত্রদের জ্ঞান-লাভে সাহায্য করা যেতে পারে।

ছায়াচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মহৎ শিল্পকর্মের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করানো যেতে পারে।

স্থানীয় যাদুঘর (ম্যুজিয়ম্) চিত্রশালা ও অতীত কীর্তির ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন দ্বারা শিল্প সম্পর্কে ছাত্রদের ঔৎসুক্য বাড়ানো যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করে, বিশেষ করে বিভিন্ন ঋতুতে 'ঋতু উৎসবে'র আয়োজন করে শিল্পসৃষ্টিতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করানো যেতে পারে।

প্রকৃতিতে যে 'ঋতু উৎসব' চলেছে তার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটাতে হবে ; এইজন্য শরতের ধানক্ষেত ও পদ্মবন, বসন্তের পলাশ শিমুলের মেলা তারা যাতে নিজের চোখে দেখে আনন্দ পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব ঋতু উৎসবের জন্য বিশেষ ছুটি দিয়ে বনভোজনের এবং ঋতু উপযোগী খেলা-ধুলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু মহাশয় বলেছেন,—"প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধন একবার হোলে, প্রকৃতিকে সত্যকার ভালবাসতে শিখলে, তাদের সৌন্দর্যের উৎস আর কখনও শুকোবে না, কারণ প্রকৃতিই যুগে যুগে শিল্পীকে শিল্পসৃষ্টির উপাদান যুগিয়ে এসেছে।"

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তৈরী শিল্পবস্তুর প্রদর্শনী খুলে একটি শিল্পসৃষ্টির উৎসব করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য যে, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়বে, সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে; ফলে তারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সত্যদৃষ্টি লাভ করতে পারবে।

সঙ্গীত ও নৃত্য

জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের ন্যায় সঙ্গীত ও নৃত্যের স্থানও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করে গেছেন। শিক্ষার্থীর চিত্তের পূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষার গোড়ার কথা। স্বদেশের সকল প্রকার বিকাশ-ব্যবস্থার সঙ্গে আপন যোগাযোগ স্থাপন করেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সাধনা সফল হতে পারে। 'সঙ্গীত ও নৃত্য' দেশের সংস্কৃতিরই অঙ্গ। বিদ্যালয়ে এদের স্থান না রাখলে দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় না।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের স্থান নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সঙ্গীতের ধারাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও জনসঙ্গীত। বিদ্যালয়ে 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত' ও 'জনসঙ্গীত' উভয়েরই চর্চার স্থান রাখতে হবে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর চর্চায় একটি নির্দিষ্ট প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুশীলন করতে হয়। এই উচ্চ সঙ্গীত বহু ধারা বিশিষ্ট।

বাংলা দেশের জনসঙ্গীতের প্রবাহটিও বহু শাখায়িত। "নদী মাতৃক বাংলা দেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোট-বড় নদীনালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙ্গালীর হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানারূপ ধ'রে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসঙ্গীতের এত বৈচিত্র্য আর কোনো দেশে আছে কিনা জানিনে।"[২৪]

আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের চর্চা অবশ্যই রাখতে হবে। বাঙ্গালী আত্মপ্রকাশের জন্য সঙ্গীতকে অবলম্বন করেছে বটে, কিন্তু সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছে আপনার রীতি অনুযায়ী। এইজন্য বাঙ্গালী কীর্তন সৃষ্টি করেছে। বিদ্যালয়-পাঠক্রমের মধ্যে সঙ্গীতকে অন্তর্ভুক্ত করবার সময় এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত।

২৪। শিক্ষার ধারা—পৃঃ ৫২

জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখার জন্য সঙ্গীতকে অবশ্যই বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। কিন্তু এর অন্য শিক্ষাগত মূল্যও আছে। এই বিষয়টি আজ বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখা উচিত। ডাঃ মন্তেসরী বলেন—শিশুচরিত্রের উপর সঙ্গীতের প্রভাব যথেষ্ট। সুরের খেলা শিশুমনে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, একটা সামঞ্জস্য আনে। এমন কি ডাঃ মন্তেসরী গানের সাহায্যে শিশুদের চরিত্র সংশোধন করতেও অগ্রসর হয়েছেন।

বিদ্যালয়ে কি ভাবে সঙ্গীতের স্থান করা যায় এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন সুস্পষ্ট মতামত দেন নি। তবে আমাদের মনে হয় বিদ্যালয়ের কার্য গান দিয়ে আরম্ভ করে গান দিয়ে শেষ করলে ভাল হয়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসবে সঙ্গীতের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বোপরি সঙ্গীতকে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে পাঠ্যতালিকায় স্থান দিতে হবে।

পরিশেষে এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্য উল্লেখ করে আমরা আমাদের এ প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করছি।

"মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করেনি, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানবসম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে, সেইখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমরবাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে; শিক্ষার্থী যারা তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক এই কামনা করি; শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশে নয়, জগতে জন্মগ্রহণ করে সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালবেসেছি ভালবাসার ধনকে, এই কথাটি মানুষকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তি দান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক, দেশের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃত অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।"[২৫]

২৫। শিক্ষার ধারা—পৃঃ ৫৭

বর্ণপরিচয় ও সহজ পাঠ

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক জীবনীগ্রন্থে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, "উদার হৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে শিল্পীজনসুলভ সৃষ্টির আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। বাংলা দেশের অসহায় শিশু ও বালকবালিকাদের কথা স্মরণ করিয়া আপন শিল্প প্রতিভাকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য 'বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী রূপ' চিরস্থায়ী খেলনা সৃষ্টি করিয়া নিজের বৃহত্তম শিল্পসৃষ্টিকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন।"[১]

বিদ্যাসাগরের মত রবীন্দ্রনাথও শিল্পিজনসুলভ সৃষ্টির আনন্দে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকটি বহুবিচিত্র খেলনা সৃষ্টি করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ে'র মত রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'ও আজ বাংলা দেশের শিশুদের নিকট বিশেষ পরিচিত।

প্রশ্ন উঠতে পারে 'বর্ণপরিচয়ের' মত বিখ্যাত পুস্তক থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য 'সহজ পাঠ' লিখতে গেলেন কেন? প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে 'বর্ণপরিচয়' ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ বাংলা দেশের শিশুশিক্ষার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক হিসাবে চলছে। 'বর্ণপরিচয়' লেখা হয় ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের জুন মাসে। এর ঠিক ৭৫ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ' ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ প্রকাশ করেন বাংলা দেশের শিশুদের প্রাথমিক পুস্তকের অভাব দূর করতে। এই প্রায় শতাব্দী কালের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার এমন কি পরিবর্তন হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথকে নূতন পুস্তক লিখবার প্রয়োজন বোধ করতে হল।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের প্রাথমিক পুস্তক হিসাবে 'সহজ পাঠের' উপযোগিতা সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার করতে হবে।

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার—পৃঃ ৯৭

আমরা বলেছি এক শতাব্দীর অধিককাল 'বর্ণপরিচয়'ই বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একমাত্র উল্লেখযোগ্য পুস্তক হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ এই যে পুস্তক দুখানি একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত এবং বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের অভিভাবকেরাও এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালাভ করেছেন—এইজন্য তাঁদের মতে তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এখানি হলো একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক।

'বর্ণপরিচয় ১ম ভাগে' শিক্ষার্থী প্রথমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পঠন ও লেখনের জ্ঞান অর্জন করে। পূর্বে বাংলা বর্ণমালা ষোলস্বর ও চৌত্রিশব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম অপ্রয়োজনীয় বর্ণগুলি পরিত্যাগ করে, বাংলা বর্ণমালাকে এক স্বতন্ত্ররূপে গঠন করেন এবং কয়েকটি নূতন বর্ণ যোগ করেন। সাধারণের অবগতির জন্য এইখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

"বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোলস্বর ও চৌত্রিশব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ-অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ঌ-কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত, এই দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এজন্য এই দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দু ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে এক স্বতন্ত্রবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ড, ঢ, য, এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে ও পদের অন্তে থাকিলে ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্নবর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়থাই পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহারা স্বতন্ত্রবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া 'ক্ষ' হয়, সুতরাং উহা সংযুক্তবর্ণ; এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।" (বর্ণপরিচয়ের ভূমিকা)

বাক্যের উচ্চারণ নির্দেশের জন্যও বিদ্যাসাগর কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ত-কারের দুটি কলেবর নির্দেশ করেছেন।

'বর্ণপরিচয়ের' সাহায্যে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে অক্ষর পরিচয়ের পর পরবর্তী পাঠসমূহে বিভিন্ন বর্ণ যোজনার সাহায্যে নূতন নূতন শব্দ গঠন সম্পর্কে নূতন পাঠ দেওয়া হয়। এই অংশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রত্যেক স্বতন্ত্রপাঠে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে একটি মাত্র স্বরবর্ণের ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথম পাঠে অ-কার, দ্বিতীয় পাঠে আ-কার, তৃতীয় পাঠে ই-কার ইত্যাদি। মধ্যবর্তী পাঠসমূহে জটিলতর উদাহরণের উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ অ-কার ও আ-কারের মধ্যে অ-কার সম্পর্কীয় তিন বর্ণবিশিষ্ট জটিলতর শব্দের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের 'বর্ণযোজনা' শিক্ষার পর, পুস্তকের শেষ অংশে দুই বা তদধিক শব্দের সাহায্যে অর্থবিশিষ্ট বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

অর্থবিশিষ্ট ও ছন্দবিশিষ্ট বাক্য কিভাবে শিশুর মনে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে, তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন।

"কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তখন 'কর, খল,' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকার ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

বর্ণপরিচয়ের পরবর্তী অংশে ছোট ছোট বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে শিশুদের পরিচিত ঘটনা থেকে। কোনরূপ অসম্ভব বা শিশুদের অপরিচিত বিষয় এই অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যথা,—

"আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না।

উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না।” ··ইত্যাদি।

এইরূপ কয়েকটি বিষয় পাঠের পর পুস্তকের শেষ অংশে ‘গোপালের গল্প’ আরম্ভ হয়েছে। গোপালের গল্পের পর রাখালের গল্প। গোপাল ও রাখালের গল্প দুটি বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের নিকট ‘ক্লাসিকাল’ গল্পের পর্যায়ে পড়ে।—“গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়।” আজও বাংলা দেশের পিতামাতারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের গোপালের মতো হবার উপদেশ দেন।

বর্ণপরিচয় লিখবার পদ্ধতিকে বলা হয় ‘যৌক্তিক’ (Logical) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে ভাষাশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রথমে বর্ণের প্রতীকগুলি আয়ত্ত করা থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে জটিলতর অংশসমূহ আয়ত্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে লিখিত পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষকের পক্ষেও শিক্ষাদান করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কারণ শিশুর ব্যক্তিগত রুচি, প্রকৃতি, যোগ্যতা ও মনস্তাত্ত্বিক গঠন যাই হোক না কেন, সমস্তই উপেক্ষা করে, শিশুর শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নত করবার জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। যৌক্তিক পদ্ধতিকে শিক্ষাবিদগণ এই কারণে বিষম (Rigid) পদ্ধতি বলেছেন।

এই প্রণালীতে লিখিত পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পক্ষেও শিক্ষকের সামান্য সাহায্য পেলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা পাঠ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশের শিক্ষার অবস্থা চিন্তা করলে মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রণালী অনুসারে পুস্তক রচনা করে ঠিকই করেছিলেন। তাই দেখি শিশুশিক্ষার জন্য প্রাথমিক পুস্তকে শিশুদের মনে আনন্দ সঞ্চারের জন্য কোন উপযুক্ত ছড়া নেই, কবিতা নেই; উপযুক্ত ছবির কথা সে যুগে আসেই না।

আমরা ‘বর্ণপরিচয়ে’র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। এখন ‘বর্ণ-পরিচয়ে’র সঙ্গে ‘সহজ পাঠে’র তুলনা করে আমরা ‘সহজ পাঠে’র

বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে চেষ্টা করব। শিশুমনের যাদুকর রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন—'বর্ণপরিচয়ে'র সাহায্যে শিশু ভাষাশিক্ষা করতে পারে বটে, কিন্তু কোন আনন্দ পায় না। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বলেন যে লেখা ও পড়া যাই শেখানো হোক না কেন—পদ্ধতি এমন হবে যে তার সাহায্যে শিশুর মনোবিকাশ সম্ভব হতে পারে; শিশু আনন্দ পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলেন 'বর্ণপরিচয়' পাঠে শিশু বানান শেখে, উচ্চারণ শেখে, কিন্তু আনন্দ পায় না। আমাদের মনে হয় এই কারণেই তিনি সহজ পাঠ লেখেন এবং সহজ পাঠ লেখবার জন্য তিনি যৌক্তিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি (Psychological Method) অবলম্বন করেন।

মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে শিশুই হচ্ছে শিক্ষার কেন্দ্রে। শিশুর ব্যক্তিগত রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্য-বিষয়ের নির্বাচন করা হয়। শিক্ষনীয় বিষয় সমূহের সঙ্গে শিশুর অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে। পড়ার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য যদি শিশু খুঁজে পায় তবে পড়াটা শিশুর জীবনে দুঃখের কারণ না হয়ে শিশুর মানসিক ও শারীরিক গঠনের সহায়ক হতে পারে। শিক্ষাটা যদি জোর করে বই মুখস্থ করানো না হয়, এবং তা যদি শিশুর জীবনে আনন্দলাভের উপায়স্বরূপ হয়, তবে বইয়ের বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে হবে শিশুর আপন অভিজ্ঞতা থেকে এবং তার অর্থও শিশুর নিকট বোধগম্য হওয়া চাই। শিশু ছন্দ ভালবাসে সুতরাং পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে শিশুর মনের মতো ছড়া ও কবিতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিশু রং ভালবাসে, ছবি ভালবাসে; সুতরাং পুস্তকে ছবির ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিশু কাজ ভালবাসে, ছবি আঁকতে ভালবাসে, —সুতরাং বইয়ের মধ্যে যদি কোন অসম্পুর্ণ ছবি দেওয়া থাকে,— তা হলে তা শিশু সম্পুর্ণ করতে পারে বা তাতে রং দিতে পারে। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে এমন বিষয়ও যেন কিছু থাকে, যা পাঠ করে শিশু চিন্তার সুযোগ পেতে পারে।

'সহজ পাঠে' আলোচ্য বৈশিষ্ট্য কতখানি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে—তা এখন আমাদের বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

শিশুশিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ' লিখেছেন। 'সহজ পাঠে' রবীন্দ্রনাথ অক্ষর পরিচয়ের কোন ব্যবস্থা রাখেন নি। এইজন্য প্রথমেই তিনি লিখেছেন,—"বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়"। বর্ণশিক্ষার জন্য ডাঃ মন্তেসরী নানা প্রকারের যন্ত্র (Apparatus) আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এরূপ কোন পদ্ধতির কথা বলেন নি। তিনি বোধ হয় পুনঃপুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির উপর নির্ভর করেছেন। শিক্ষার এই পদ্ধতিতে শিক্ষকেরও যথেষ্ট অংশ থাকে।

রবীন্দ্রনাথ সহজ পাঠের প্রথম অংশে এগারোটি স্বরবর্ণের উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর বারোটি স্বরবর্ণ সম্পর্কে বলেছেন, অর্থাৎ তিনি ৯-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ৯-কে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ৩৪টি বর্ণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমদিকে ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নি, কিন্তু বর্ণযোজনা ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সহজ পাঠের (১ম ভাগ) প্রথম দিকে অ, আ ইত্যাদির ব্যবহার দেখিয়েছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছন্দের সাহায্যে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের উচ্চারণ শেখানো। সমস্ত অক্ষরগুলিরই উচ্চারণ যে তিনি এই ভাবে ছন্দের সাহায্যে দেখাতে পেরেছেন,—তা নয়, অধিকাংশ জটিল উচ্চারণের ক্ষেত্রে তিনি এই পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। যেমন,—

'অ' 'আ'-এর ক্ষেত্রে—

ছোটো খোকা বলে অ আ
শেখেনি সে কথা কওয়া।

'ঋ'-এর ক্ষেত্রে,—

ঘন মেঘ বলে ঋ
দিন বড়ো বিশ্রী।

'ঙ'-এর ক্ষেত্রে,—

চরে ব'সে রাধে ঙ
চোখে তার লাগে ধোঁয়া।

'ঞ'-এর ক্ষেত্রে,—

খিদে পায়, খুকি ঞ
শুয়ে কাঁদে কিয়োঁ কিয়োঁ।

'ক্ষ'-এর ক্ষেত্রে,—

শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ
কোণে বসে কাশে খ ক্ষ।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—রবীন্দ্রনাথ বর্ণপরিচয়ের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ করেন নি। তিনি নির্ভর করতে চেয়েছেন শিক্ষক ও শিশুর শক্তির উপর। পাঠের প্রথমেই তিনি ছন্দের প্রয়োজন বোধ করেছেন; বিশেষ করে বর্ণের উচ্চারণ শেখাবার জন্য তার প্রয়োগ করেছেন সুন্দরভাবে। বিদ্যাসাগরের পক্ষে শিশুচরিত্রকে এই ভাবে দেখা সম্ভব হয় নি। তার কারণ বোধ হয় তিনি বাংলা গদ্যের জন্মদাতা এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। উভয়েরই জীবন-দর্শন ও কর্মক্ষেত্র আলাদা। দুইজনের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে। এই সমস্ত বিষয় যে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পরবর্তী পাঠ অর্থাৎ 'বর্ণযোজনা ক্ষেত্রে' রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। তিনি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psychological Method) গ্রহণ করেছেন, শিক্ষাবিদগণ ঐ পদ্ধতিকে বলেন "সামগ্রিক পদ্ধতি" (Global Method)।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পদ্ধতিতে যৌক্তিক পদ্ধতির মতো শিক্ষার্থীকে বর্ণপরিচয় সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না। বর্ণের পরিবর্তে অর্থবোধক শব্দ বা বাক্য লিখতে বা পড়তে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির উন্নততর পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক

শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তে একটি আখ্যান বা বর্ণনার (Story) সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। ভাষাশিক্ষা দেবার এই আধুনিক পদ্ধতিকে আমরা আখ্যানমূলক পদ্ধতি (Story Method) বলতে পারি।

শিশু যখন এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি শব্দ বা বাক্য বা একটি গল্পাংশ পড়তে বা লিখতে শেখে,—তখন শিক্ষক ঐ শব্দ বা বাক্য বা গল্পাংশ যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণাংশের সাহায্যে গঠিত হয়েছে তার দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমেই একটি অর্থবোধক বাক্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মানসিক তৃপ্তি ঘটে এবং সে নিজেই শিক্ষার উপযোগিতা অনুভব করতে পারে। অধিকন্তু যে শিক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থী আনন্দ খুঁজে পায়, সেই শিক্ষায় তার মানসিক বিকাশও দ্রুততর হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই 'সামগ্রিক পদ্ধতি' কতটুকু কাজে লাগিয়েছেন, তা এখানে আলোচনা করলে মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

তিনি 'সহজ পাঠ—১ম ভাগে'র প্রথমেই যে পাঠটি দিয়েছেন তা একটি সহজ বর্ণনা ছাড়া কিছুই নয়।

যেমন,—"বনে থাকে বাঘ।
গাছে থাকে পাখি।
জলে থাকে মাছ।
ডালে আছে ফল।
পাখি ফল খায়।
পাখা মেলে ওড়ে।"

অথবা,

"বাঘ আছে আম-বনে।
গায়ে চাকা চাকা দাগ।" ইত্যাদি।

'সহজ পাঠে'র ২য় পাঠটি এইরূপ,—

"রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি। জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। জলে আছে লাল ফুল।"—ইত্যাদি।

নবম পাঠ থেকে উদাহরণ।—

"এসো এসো, গৌর এসো। ওরে কৌলু, দৌড়ে যা। চৌকি আন্। গৌর, হাতে ঐ কৌটো কেন?

"ঐ কৌটো ভরে মৌরি রাখি। মৌরি খেলে ভালো থাকি।" ইত্যাদি।

সহজ পাঠে (১ম ভাগ) সবশুদ্ধ মোট দশটি পাঠ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি পাঠ গদ্য ও পদ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। আমরা এখানে গদ্যাংশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছি।

গদ্যাংশগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে,—

(১) প্রত্যেকটি পাঠে একটি ঘটনার সহজ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(২) 'বর্ণপরিচয়ে'র মত শব্দকে বাক্য থেকে আলাদা করে দেখানো হয়নি।

(৩) বাক্যকেও একটি সম্পূর্ণ বর্ণনার অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

(৪) প্রত্যেক পাঠের বর্ণনার বিষয়টি নেওয়া হয়েছে শিশুর পরিবেশ থেকে, শিশুর অভিজ্ঞতার অংশ হিসাবে।

(৫) প্রত্যেক পাঠে একটি গল্পের আভাস রয়েছে। সুতরাং পড়বার সময় শিশু আনন্দ পাবে আশা করা যায়।

(৬) 'বর্ণপরিচয়ে'র বর্ণযোজনার ক্ষেত্রে যেমন সহজ থেকে কঠিনে নিয়ে যাবার জন্য একটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে, 'সহজ পাঠে' সেটি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ 'বর্ণপরিচয়ে' প্রথমে অ-কার, পরে আ-কার, ই-কার, ঈ-কার ইত্যাদি স্বরবর্ণের প্রয়োগ সম্পর্কে যেমন বহু উদাহরণ পর পর দেওয়া হয়েছে, 'সহজ পাঠে' তার ব্যতিক্রম আছে। প্রথম পাঠেই অ-কার, আ-কার, ই-কার, ইত্যাদি বিভিন্ন স্বরবর্ণের প্রয়োগ একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীকে নানা বিষয় একত্রে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে হবে।

(৭) কিন্তু বর্ণনা ও ভাষার বিষয় বিবেচনা করলে বিভিন্ন পাঠের মধ্যে সহজ থেকে কঠিনে নিয়ে যাবার একটা চেষ্টা দেখা যায়।

(৮) বর্ণপরিচয়ের মতো সহজ পাঠেও কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ নেই।

(৯) পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তার মিল থাকাতে শিশু পুঁথির পড়া ও আপনভাবের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে। এর ফলে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে শিশু আনন্দ পাবে এবং তা তার কল্পনাশক্তি প্রসারে সহায়তা করবে।

প্রত্যেকটি পাঠের দ্বিতীয় অংশে কবিতা। ছন্দের রাজা রবীন্দ্রনাথ যে শিশুকে ভাষা শেখাবার জন্য ছন্দের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন, এ খুবই স্বাভাবিক। 'সহজ পাঠ, প্রথম ভাগে' রবীন্দ্রনাথ যে সকল কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা সাধারণতঃ ছন্দ-প্রধান ও বর্ণনামূলক। কোন কোন কবিতার অর্থ শিশুর পক্ষে সহজবোধ্য বলে মনে না হতে পারে,—তবে ছন্দের কথা বিবেচনা করলে তাদের প্রয়োজন সমর্থন করা যেতে পারে। অর্থাৎ কোন কবিতা যদি কেউ না বুঝতে পারে, সে কবিতাটি সুর করে আবৃত্তি করেও কিছু রস পেতে পারে। শিশুদের জন্য প্রাথমিক পুস্তকে এইরূপ পাঠ দেওয়ার স্বপক্ষে লেখকের যুক্তি এই যে, প্রথম থেকেই শিশুদের 'বেশী শিশু' মনে না ক'রে,—তারা যা বুঝতে পারে তা'র চেয়ে একটু বেশী জিনিস বরাদ্দ করা শিশুমনের বিকাশের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত।

'সহজ পাঠে' উল্লিখিত কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী কবিতা নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির একটু আলোচনা এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

'সহজ পাঠে'র নিম্নলিখিত কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়।

প্রথম পাঠ ঃ

"আলো হয় গেল ভয়।
চারিদিক ঝিক মিক্।
বায়ু বয় বন ময়।
বাঁশ গাছ করে নাচ।" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ

"কালো রাতি গেল ঘুচে,
আলো তারে দিল মুছে।
পুব দিকে ঘুম-ভাঙ্গা
হাসে উষা চোখ-রাঙা।
* * *
তারাগুলি নিয়ে বাতি
জেগেছিল সারা রাতি,
নেমে এল পথ ভুলে
বেল ফুলে জুঁই ফুলে।
* * *
বনে বনে পাখি জাগে।
মেঘে মেঘে রঙ লাগে।
জলে জলে ঢেউ ওঠে।
ডালে ডালে ফুল ফোটে।"

কবিতা দুইটিতে একই ধরনের বর্ণনা রয়েছে; কিন্তু ছন্দ ও ভাবের দিক থেকে বিবেচনা করলে দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে কঠিন।

সপ্তম পাঠ ঃ

"কাল ছিল ডাল খালি,
আজ ফুলে যায় ভ'রে।
বল্ দেখি তুই মালী,
হয় সে কেমন ক'রে।" ইত্যাদি।

গদ্য অংশের মত কবিতার অংশেও রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা ও ছন্দের বৈচিত্র্যের সাহায্যে কবিতাগুলিকে সহজ থেকে কঠিনে নিয়ে চলেছেন। আমরা কবিতার যে অংশ কয়টি উল্লেখ করেছি, তাতে দেখেছি কবিতার বিষয়বস্তু বর্ণনামূলক, শিশুর পরিবেশকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। কিন্তু সপ্তম পাঠের কবিতাটিতে ভাব ও ছন্দ আরও বেশী জটিল এবং ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে ওগুলির অর্থবোধ করা কঠিন সন্দেহ নেই।

ফুলের গাছে নূতন ফুলের আবির্ভাব হয় কেমন করে,[২] এই চিররহস্যময় প্রশ্নের উত্তর শিশুর নিকট অজ্ঞাত। ফুলগুলি গাছের ভিতর থেকে কেমন করে যাওয়া-আসা করে? ওরা কি বাতাসের ডাকে বেরিয়ে আসে? ওদের ঘর কোথায়? সে ঘর কি মাটির কাছে? কিন্তু দাদা বলে,—"জানি জানি, সে ঘর আকাশে আছে।" সেই ঘরে নানা রঙের মেঘ, আলো, হাওয়া যাওয়া-আসা করে গোপন দরজা দিয়ে।

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের মাত্রাও ঠিক করে দিয়েছেন শিশুদের আবৃত্তির সুবিধার জন্য।

পরবর্তী পাঠে কবিতাগুলিতে আরও জটিলতর ভাবের সমাবেশ করা হয়েছে।

যেমন,—

"কত দিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে,
যেথা খুসি সেথা যাব ভারি মজা হবে।"

তাই শিশু কল্পনায় মনে করছে ফুল যেন প্রজাপতি হয়ে গেল রঙীন ডানা মেলে। ঘরের প্রদীপের আলো যেন জোনাকিতে পরিণত হল; পুকুরের জল 'ধোঁয়া ডানা মেলে' মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে গেল। আর শিশু ভাবছে সে কবে ঘোড়া হয়ে মাঠ পার হবে, মাছ হয়ে সাঁতার কাটবে, পাখি হয়ে আকাশে উড়তে পারবে। শিশুমনের কল্পনা কি সত্যি হয় না!

কবিতার ভাবটি ছয় সাত বৎসরের শিশুদের পক্ষে একটু জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিশুরা যা বুঝতে পারবে তার চেয়ে একটু বেশী বরাদ্দ করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

'সহজ পাঠে'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে এতে প্রায় প্রতি পাতায় ছবি দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলি রঙীন নয়। রঙীন ছবি না দেওয়ার কারণ বোধ হয় যে, শিশু নিজের ইচ্ছামত রং দিয়ে ছবিগুলি রঙীন

২। তুলনীয়—"খোকা মাকে শুধায় ডেকে এলাম আমি কোথা থেকে।"—(শিশু)

করতে পারবে। সহজ পাঠ প্রথম ভাগ থেকে সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগে এই রং দেওয়ার সুযোগ বেশী রয়েছে,—কারণ ঐ পুস্তকে ছবিগুলি অন্য ধরনে রেখায় আঁকা হয়েছে। ছবি আঁকা ও রং দেওয়ার সুযোগ থাকায় পড়ার সঙ্গে শিশু কিছু কিছু কাজের আনন্দও পাবে।

প্রথম ভাগের বৈশিষ্ট্য পুস্তক দুখানির দ্বিতীয় ভাগেও বজায় রয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

'বর্ণপরিচয়' ও 'সহজ পাঠে'র বিষয়বস্তু সাজানোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা ব্যাপক আলোচনা করেছি। বর্ণপরিচয়ের সাহায্যে যে পদ্ধতিতে ভাষা লিখতে ও পড়তে শেখানো হয় তাকে শিক্ষাবিজ্ঞানে বলা হয় 'বর্ণভিত্তিক পদ্ধতি' (Alphabet Method)। বর্ণই হচ্ছে ভাষার প্রাথমিক অংশ বা উপাদান (Element)। বর্ণভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রথমে বিভিন্ন বর্ণ লিখতে ও পড়তে শেখানো হয়, পরে বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে শব্দগঠন ও শব্দের বানান শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার শব্দ লিখতে ও পড়তে শেখার পর বিভিন্ন শব্দের যোগে বাক্য-রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষার্থীকে অংশ (Part) থেকে সম্পূর্ণতার (Whole) দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে এই পদ্ধতিকে বলা হয় সংশ্লেষণ-পদ্ধতি (Synthetic Method)। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বর্ণপরিচয়' লিখতে এই সংশ্লেষণ-পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠে' যে পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন তাকে বলা হয় 'বিশ্লেষণ-পদ্ধতি' (Analytic Method)। এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি সম্পূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় সাধন করে, পরে ঐ সম্পূর্ণ বিষয়টি যে যে অংশের সাহায্যে গঠিত, তার দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। একে আমরা রচনাভিত্তিক পদ্ধতিও (Story Method) বলতে পারি। অবশ্য একে সম্পূর্ণভাবে 'বিশ্লেষণ-পদ্ধতি' বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ পরবর্তী ধাপে আমরা সংশ্লেষণ-পদ্ধতিরও ব্যবহার দেখতে পাই। সুতরাং 'রচনাভিত্তিক পদ্ধতি'কে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ পদ্ধতির মিশ্রণ বলা যেতে পারে।

'সহজ পাঠ' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকখানি বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেছেন। ঐগুলিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুশিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেছেন। শিশুর মনোবিকাশের জন্য পরিবেশ, শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যবিষয় সমূহেরও যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি প্রভাব আছে পাঠ্যপুস্তকের। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকেরও যে প্রয়োজন আছে এ কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত।

শিক্ষার কেন্দ্রে গুরু

রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাদর্শের কথা বলেছেন—গুরুকে বসিয়েছেন তার কেন্দ্রে। এই নীতি ভারতের প্রাচীনকালের ঐতিহ্যের অনুরূপ। তার কারণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন যে, মানুষ একমাত্র মানুষের নিকট থেকেই শিখতে পারে. যেমন শিখার দ্বারা শিখা জ্বলে উঠে, প্রাণের দ্বারা প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন,—

"পূর্বে আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পেতেম। দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেন না মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তার আপন সাধনার অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তার অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক প্রাণচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।"[১]

১। শিক্ষা (আশ্রমের শিক্ষা)—পৃঃ ৩২৭

রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে এই গুরুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন।

প্রাচীনকালের নালন্দা প্রভৃতি বিদ্যায়তনের উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে, সেখানে শুধুমাত্র বিদ্যার সঞ্চয় নয়, বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের যশ ছিল বহুদূরব্যাপী; তাঁদের চরিত্র ছিল পবিত্র, অনিন্দ্যনীয়। তাঁরা সদ্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতেন। সমস্ত দেশ এবং দূর দেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল করে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে; কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহুশ্রুতের দ্বারা নয়; চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেন না সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছে। আচার্যেরা জানতেন, দূর দূর দেশকে জ্ঞান বিতরণের মহৎ ভার তাঁদের 'পরে; সমুদ্র পর্বত পার হয়ে, প্রাণপন কঠিন দুঃখ স্বীকার করে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞান পিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার 'পরে সর্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন, আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে সহজ হয় না।[২]

প্রাচীন কালে সমাজে গুরু যে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার কারণ এই যে বিদ্যাদান তাঁদের জীবনের ধর্ম ছিল। বিদ্যাদানের মধ্যেই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য নিহিত ছিল।

"পুরাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থ ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। যথাকালে যথাস্থানে যথাপাত্রে দান করার দ্বারা তিনি নিজেকেই জানতেন সার্থক। তেমনি যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব তিনি স্বতই গ্রহণ করতেন। তিনি জানতেন, যা পেয়েছেন তা দেবার সুযোগ না পেলে পাওয়াই থাকে অসম্পূর্ণ। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই পরস্পর সাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ্য বলে জেনেছি।"[৩]

২। শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ)—পৃঃ ২৭১, ৩। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ৯

গুরু ও শিষ্যের উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপনের উপর শিক্ষাদানের কার্যকারীতা নির্ভর করে। শিক্ষাদান ব্যাপারে "গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রমশই।"[৪]

তার কারণ অবশ্যই আছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমরা শিক্ষাদানের জন্য প্রকৃত গুরুর সন্ধান পাচ্ছি না। আজ শিক্ষা-সংস্কারের জন্য আমাদের প্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু যিনি সাধনার জোরে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নূতন জীবন সঞ্চার করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এই গুরুর সন্ধান আমরা কেমন করে পেতে পারি? 'শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে কিন্তু গুরু তো ফরমাস দিলেই পাওয়া যায় না।' এই গুরুর বৈশিষ্ট্য কি? তিনি শিক্ষাদানকে ও বিদ্যা চর্চাকে নিজের সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করবেন। তিনি হৃদয়ের প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করে ছাত্রদের বিদ্যাদান করবেন। গুরু নিজের স্বভাব ধর্মে জ্ঞানদান করবেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করবেন;—তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হবে। গুরুকে বিদ্যাদান করতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে, তবেই শিষ্যের পক্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব। এই শ্রদ্ধার অভাব হলে শিক্ষাদান কার্য আদান-প্রদানের সম্পর্ক হয়ে দাড়ায়।

এই প্রকৃত গুরুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র[৫] সুন্দর করে বলেছেন।—

"A most important truth, which we are apt to forget, is that a teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light

৪। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ৬১,

৫। *Creative Unity* (An Eastern University), Page 187

another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, who has no living traffic with his knowledge, but merely repeats his lessons to his students, can only load their minds ; he can not quicken them. Truth not only must inform but inspire. If the inspiration dies out, and the information only accumulates, then truth loses its infinity. The greater part of our learning in the schools has been wasted because, for most of our teachers, their subjects are like dead specimens of once living things, with which they have a learned acquaintance, but no communication of life and love."

গুরুকে জ্ঞানলাভের জন্য তপস্যা করতে হবে এবং এই তপস্যায় সঙ্গী হবে ছাত্রেরা। তাই দেখি প্রাচীনকালে গুরু গৃহী ছিলেন, আশ্রমে বাস করতেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মত তাঁদের সেবা করে বিদ্যা গ্রহণ করতো। অর্থাৎ যেমন গুরু করবেন বিদ্যাসৃষ্টির সাধনা, শিষ্য করবে বিদ্যা গ্রহণের সাধনা। এই সাধনার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ, প্রাচীন আশ্রমের পবিত্র পরিবেশ। কারণ, "যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয়, সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি। যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্ত সাধনা, সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।"[৬]

গুরু যেমন নিজেকে জ্ঞানদানের উপযুক্ত করে গঠন করবেন, শিষ্যকেও তেমনি ঐ জ্ঞানগ্রহণের উপযুক্ত হতে হবে। গুরুর অন্তরে যেমন স্নেহ থাকবে, শিষ্যকেও তেমনি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে। কারণ,—"শ্রদ্ধয়াদেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে।"

৬। শিক্ষা—পৃঃ ৬৭

এই জ্ঞানদানের জন্য গুরুকে হতে হবে ধৈর্যবান্। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসে সম্ভব।[৭]

এই জন্য ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে একটা সত্যসম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। এই প্রেম ও কর্তব্যের কথা মনে রেখেই গুরুকে শিক্ষাদানের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে হবে। এই কার্যে তিনি কতটুকু সফল হলেন সেটি প্রধান বিষয় নয়; প্রধান বিষয় হচ্ছে যে তিনি জীবনপণে তার সংকল্পকে প্রকাশ করেছেন কি না। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের তপস্যার উদাহরণটি দিয়েছেন।

"একদিন বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখকে দূর করব।' দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কিনা, সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।"[৮]

অর্থাৎ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককেও জীবন উৎসর্গ করতে হবে। তবে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা শুধু সংবাদ বিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায়নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করতে হবে। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষকের কাজে শুধু ধৈর্য প্রয়োজন নয়, তাকে মাতাপিতার স্থান গ্রহণ করতে হবে। মাতাপিতার মত ধৈর্যে স্নেহে প্রেমে ছাত্রকে মানুষ করবার চেষ্টা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

৭। শিক্ষা—পৃঃ ৩৩৩, ৮। শিক্ষা—পৃঃ ৯২

"গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তি দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারক রস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে।"

শিক্ষাদান কার্যে অন্য একটি বিষয় শিক্ষকদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। শিক্ষকেরও উচিত ছাত্রদের সম্মান করা। এই সম্মান করার প্রয়োজন হয় বিশেষ করে যখন তারা যৌবনে পদার্পণ করে। স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

"এই জন্যই সকল দেশেই য়ুনিভার্সিটিতে যৌবনে ছাত্ররা একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সেই সুযোগে তাহাদের জীবনের 'পরে মানব সংশ্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলি আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে,—এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই।"[৯]

শিক্ষাদান কার্য সফল ভাবে সম্পন্ন করতে হলে ছাত্রদের ব্যবহার ও আচরণে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন। এই শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদেরও যথেষ্ট সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদের জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই হিসাবে দেখলে চলবে না। শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শিক্ষককে এ কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ছাত্ররা সজীব মানুষ এবং একটি বিশেষ প্রকৃতির অধিকারী এবং মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করে গড়া। সুতরাং শিক্ষকের কাজ জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া নয়। ছাত্রদের শ্রদ্ধা না করতে পারলে শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষার ভার নেওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রদের মিত্র বলে গ্রহণ করেন।

৯। শিক্ষা—পৃঃ ২১০

ছাত্রদের বিশেষ প্রকৃতিটি বুঝতে হলে শিক্ষকের মনের চরিত্রও অনুরূপ হওয়া উচিত। অর্থাৎ গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষী ভাবটি বজায় রাখা উচিত। "গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদী যোগেই তিনি পূর্ণ নন। তাঁর প্রথম আরম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরনার প্রবাহ পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপনার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাবার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে, ছেলেদের আঙিনায় চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকাশাখায় কচিশাখায় ফুল ফোটাবার, ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে।"[১০]

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বহুবিধ ত্রুটির অন্যতম ত্রুটি এই যে, আমরা শিক্ষার কেন্দ্রে গুরুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা যে একমাত্র উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত গুরুর দ্বারাই সফল হওয়া সম্ভব—এই সত্যটি পরিপূর্ণভাবে আমরা এখনও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ করতে পারি নি। এর কারণ আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত যান্ত্রিক। তাই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,—

১০। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ৯

"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দেবার কল। মাস্টার এই কারখানার অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়। মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।"[১১]

এই ধরনের বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা দেবার কার্যভার গ্রহণ করেন, তাঁদেরও যন্ত্রের অংশ হিসাবে কাজ করতে হয়। সমাজও যেন এদের নিকট থেকে ফরমাশ-মত জিনিস পেলেই খুশি। এতে ভালমন্দ হিসাবে মার্কা দেবার সুবিধা হয়। কিন্তু আমরা বুঝি না যে 'এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের অনেক তফাত'। মানুষের কাছ থেকে মানুষ যা পেতে পারে কলের কাছ থেকে তা পেতে পারে না।

তবুও,—"আমরা যাহাকে স্কুলের শিক্ষক করি তাহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয় মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে; ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ শিক্ষা-পরিকল্পনা করেছেন,—সে পরিকল্পনায় শিক্ষককে এইরূপ যন্ত্রের কাজ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন এবং তাঁকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে গুরুর আসনে বসাতে চেয়েছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন—শিক্ষকদের নিকট থেকে পুরা কাজ পেতে হলে এই ব্যবস্থা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন,—"কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি

১১। শিক্ষা—পৃঃ ৪৫

তিনি দিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে।"

আজ আমাদের দেশে শিক্ষার দুর্গতির মূলে রয়েছে শিক্ষকের প্রতি অবহেলা। আজ সমগ্র সমাজকে যেমন শিক্ষকের প্রতি আপন দাবি উত্থাপন করতে হবে, তেমনি শিক্ষকের প্রতিও সমাজকে আপন কর্তব্য পালন করতে হবে। কারণ শিক্ষককে উপযুক্ত সম্মান না দেখালে, শিক্ষকও আপন কর্তব্য উপযুক্ত ভাবে পালন করতে পারেন না।

"এক পক্ষ হইতে যথার্থ ভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্‌বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।"

বলা হয় বর্তমানে শিক্ষকেরা অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদান করেন, প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের গুরুর আদর্শ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। বর্তমানে ছাত্র ও শিক্ষকের যে সম্পর্ক—তা খরিদ্দার ও দোকানদারের সম্পর্ক। আজকাল শিক্ষক ছাত্রের খোঁজ করেন বিদ্যা বিক্রয়ের আশায়, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের উচিত গুরুকে লাভ করা।

যেখানে শিক্ষকছাত্রের সম্পর্কে দেনা-পাওনার সম্পর্ক, সেখানে স্নেহ, শ্রদ্ধানিষ্ঠার নিশ্চয়ই অভাব থাকবে এবং এই প্রকারের ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের দ্বারা শিক্ষার মূল লক্ষ্য কোনক্রমেই সম্পন্ন হয় না।

"তবুও নানা প্রকারের প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা দেনা-পাওনার সম্পর্ক ছাড়াইয়া উঠেন, নিজেদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালাতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধিত করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন ও তবেই তিনি এমন জিনিস দান করিতে

পারেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত ; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে, তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।"[১২]

এই রকম শিক্ষক আমাদের দেশে আধুনিক কালেও অনেক জন্মেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিয়ো, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"এদেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ দিনে ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার,—ইহারা শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না।"[১৩]

প্রাচীন কালে শিক্ষকেরা মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্ররা তা খাতায় নয়, মনের মধ্যেই লিখে নিত। শিক্ষক যদি প্রকৃত দরদী হন এবং শিক্ষাদানের জন্য একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁদের থাকে, তবে শিক্ষাদান কার্য বহুলাংশে সফল হতে পারে।

এমন কি—"অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা ; তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত,—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া দুইয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে, শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার

১২। শিক্ষা—পৃঃ ৫৯ ১৩। শিক্ষা—পৃঃ ১৬৬

মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।”[১৪]

আমরা বলেছি সমাজকে শিক্ষকের নিকট থেকে কিছু দাবি করতে হলে, শিক্ষককেও সমাজের কিছু দিতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতে হবে। কারণ, “শ্রদ্ধা না পাইলে শিক্ষক মানুষ না হইয়া মাষ্টার মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়।”

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের নিকট থেকে যে সকল গুণ দাবি করেছেন, আমাদের বর্তমান সমাজে ঐরূপ শিক্ষক পাওয়া কঠিন সন্দেহ নাই। তাঁর শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ বহু শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁদের যোগ্যতা পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষক সন্ধানের জন্য তাঁকে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত বিবরণটি বড়ই সুন্দর।

“আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছ তলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি. বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলে-কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়েছি—তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

“এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, ‘অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাশের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাশ হয়ে গেছে।’ তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখে শুনে বললেন, ‘ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।’ আমি বললাম, ‘দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন

১৪। শিক্ষা—পৃঃ ৮৭

সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাশের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। তারপর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।"[১৫]

এই সম্পর্কে আর একটি ঘটনার কথাও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। বহুস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসার সঙ্গে দান না করলে কোন বিদ্যা ছাত্ররা গ্রহণ করতে পারে না।

একজন ইংরেজ শিক্ষককে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে আনয়ন করেছিলেন ছাত্রদের ইংরাজী শেখানোর জন্য। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাশে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন; তারা বাঙ্গালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা—তাদের বয়স নয় দশ বৎসর হইবে, তবু তাঁর ক্লাশে যাওয়া ছাড়িল। হেডমাস্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই হেডমাস্টারটিকে 'White men's burden' হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।"[১৬]

এই শিক্ষকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—"তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরস্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাশে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম, শিক্ষক যেমনই দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত,

১৫। বিশ্বভারতী—পৃঃ ২৭; ১৬। শিক্ষা—পৃঃ ২২১

কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না—কিন্তু, তাদের অ্যাক্‌সেন্ট বিশুদ্ধ হইত।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ উক্ত ইংরেজ শিক্ষককে আপনার বিদ্যালয়ে রাখতে চাননি;—কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন 'যারা ছাত্রদের উপকার করছি' এই মনোভাব নিয়ে শিক্ষকতা করতে যান তাঁদের শিক্ষক হবার যোগ্যতা নেই। ছাত্রদের হৃদয়মনকে প্রেমের রসে অভিষিক্ত না করলে, শিক্ষকের নিকট থেকে ছাত্ররা বিদ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বিদ্যা বিক্রয়ের বা দেনা-পাওনার জিনিস নয়, তা ভালবাসার দান। "শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই, সেখানে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে এই গুরুকে প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিলেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য মানুষের সমাবেশ ঘটিয়ে। তিনি নিজের জীবনেও এই গুরু হবার তপস্যা করেছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁকে 'গুরুদেব' এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে এই নামেই ডাকছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,—

"তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন—আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিকভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এ উপাধিটিও তেমনি।"[১৮]

আমাদের শিক্ষাসংস্কারের প্রধান উপায় হিসাবে আজ আমাদের শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে গুরুকে দরকার। শুধুমাত্র প্রণালীর দ্বারা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করা সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

১৭। শিক্ষা—পৃঃ ২২২, ১৮। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ৬২

"বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। ··· আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধা মুক্ত করিবেন।"[১৯]

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনের ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরুর মত গুরুকেও আজ মুক্তিকামী ছাত্রদের প্রাচীন মন্ত্রে আহ্বান করে বলতে হবে,—

"যথাপঃ প্রবতা যান্তি যথামাসা অহর্জরম এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। ···

"জল সকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারীগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা। ···

সহবীর্যং করবাবহৈ।

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্যপ্রকাশ করি।

তেজস্বি-নাবধীতমস্তু।

তেজস্বী ভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক।

মা বিদ্বিষাবহৈ।

আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।

ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ।

হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।"[২০]

১৯। শিক্ষা—পৃঃ ১৬৮; ২০। শিক্ষা—পৃঃ ৮৩

ছাত্রধর্ম

প্রাচীন ভারতবর্ষে ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ', অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের সাধনাই ছাত্রদের জীবনের একমাত্র সাধনা। যে কেউ এই জ্ঞানার্জনের অধিকারী হতে পারে না। জ্ঞানার্জনের সাধনার জন্য শরীর ও মনের উপযুক্ততার প্রয়োজন। শরীর ও মনের যোগ্যতা না থাকলে এই জ্ঞানার্জনের সাধনার সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় না।

এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না, প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন কি, উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায়, কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না।"[১]

কারণ বিদ্যালাভের জন্য ছাত্রজীবনে বিশেষ প্রস্তুতি দরকার। এই প্রস্তুতি একদিনে সামান্য চেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অঙ্গের সঙ্গে একে মিলিয়ে শরীর ও মনকে বিদ্যালাভের উপযুক্ত করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—একখণ্ড পাথর ও একটি বীজের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে; পাথর একখণ্ড পাথর মাত্র, কিন্তু বীজের মধ্যে ভাবীকালের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে এই সম্ভাবনাকে রূপ দেবার প্রয়োজন আছে।

শিশুর জীবনও তেমনি, বৃহৎ সম্ভাবনার গৌরবে গৌরবান্বিত। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে এই সম্ভাবনাকে বিকাশের দিকে নিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কি ভাবে আমরা শিশুকে রক্ষা করতে পারি, বিদ্যালাভের তপস্যার জন্য তাকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারি?

১। শিক্ষা—পৃঃ ১২১

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতে হয়। ··· প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে, বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

"ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়—জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্য-শোষণ শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টি সাধন করা।"[২]

সংসারের পরিবেশে এই কাজটি হওয়া কঠিন। কারণ, 'সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি'। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।' ছেলেরা যদি শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে শক্তিলাভ করে এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূল পত্তন করতে সক্ষম হয়, তা হলে শিক্ষাসমাধা করবার পর তারা গৃহী হবার যথার্থ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারে। অর্থাৎ বৃক্ষের মতো কাণ্ড শক্ত হলে বাইরের শক্তি বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে পারে না। "কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি সংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হ'লে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। কারণ, সংসারের প্রবৃত্তি সংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়।"

২। শিক্ষা—পৃঃ ৬৫

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা ; বোধের তপস্যা নয়।

"বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে, আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই ; লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

"এই জন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক,—ভোগ বিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

"যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় তপস্যা। সুতরাং জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রকে তপস্বীর জীবন যাপন করতে হবে। জ্ঞানলাভের সময় ছাত্রকে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা নিজের জীবনকে কঠোর সাধনার উপযুক্ত করতে হবে।

ভারতবর্ষের ঋষিরা তপস্যাকেই জ্ঞানরূপে বর্ণনা করেছেন। এই তপস্যার রূপটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বভারতী" পুস্তকে সুন্দর করে বলেছেন,—

৩। শিক্ষা—পৃঃ ১২৫

"স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।— সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তার সেই তপস্যা নিহিত। সেইজন্যই তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃ-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে। সেও চুপ করে বসে নেই। কেন না মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃ ক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে।"[৪]

এই জ্ঞানের সাধনার জন্যই ছাত্রজীবনের প্রস্তুতি ; কারণ জ্ঞান-লাভই ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য। তাই ছাত্রজীবনের প্রার্থনা হচ্ছে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রার্থনা। উপনিষদ এই প্রার্থনাকে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন ;—

"ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

আমার অঙ্গসমূহ বাক্ প্রাণচক্ষু শ্রোত্র বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—ছাত্রদের বাল্যকাল থেকেই এই জীবনের জন্য সাধনা করতে হবে। বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ও মন সবল না হলে এই জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। এই প্রস্তুতির জন্যই ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন প্রয়োজন। এই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য লোভের উপকরণ থেকে মনকে মুক্ত করে জ্ঞানের সাধনায় নিযুক্ত করা। [illegible]কে মুক্ত করার সাধনা খুব কঠোর সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য বিশ্বপিতার আশীর্বাদই একমাত্র অবলম্বন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রার্থনার দ্বারাই ছাত্রদের এই শক্তিলাভ করতে

৪। বিশ্বভারতী—পৃঃ ৫৩

হবে। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনার জন্য যে মন্ত্রটির উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন তাহা হচ্ছে এই।—

"ওঁ পিতানোঽসি।"

ঈশ্বর যে আমাদের পিতা এবং তিনিই যে আমাদের পিতার ন্যায় জ্ঞানশিক্ষা দিচ্ছেন—এই কথা ছাত্রদের বারবার স্মরণ রাখতে হবে। "অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই।"

বিশ্বপিতার নিকট থেকে জ্ঞানলাভের জন্য চিত্তকে সর্বপ্রকার মালিন্য থেকে মুক্ত করতে হয় এবং এইজন্যও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা প্রয়োজন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রার্থনার জন্য ছাত্ররা উচ্চারণ করবে—

"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।"

হে দেব, হে পিতঃ, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।

রবীন্দ্রনাথের মতে—"ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র,—

যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।"[৫]

কিন্তু শুধুমাত্র মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারাই শিক্ষার্থীর বিদ্যালাভের অধিকার জন্মায় না। বিদ্যালাভের জন্য শিক্ষার্থীকে আচরণে ও মনে পবিত্র হতে হবে। আচরণে ও মনে পবিত্র হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কয়েকটি ব্রতপালনের কথা বলেছেন। এই ব্রতপালনের জন্য শিক্ষার্থী যেমন সাধনা করবে, গুরুও তেমনি তাকে সাহায্য করবেন। অভ্যাসযোগের দ্বারা শিক্ষার্থী নিজেকে কঠোর ব্রত পালনের উপযুক্ত করবে। এই ব্রত পালনই ব্রহ্মচর্যপালন। এই

৫। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ২৮

ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারাই শিক্ষার্থী নিজের শরীর ও মনকে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে, সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতাদ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠার দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্তযোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য ব্রত।"[৬]

ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের মনের সমস্ত চেষ্টা হবে কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজেদের ভাল গুণকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দ্বারা কয়েকটি বিশেষ ব্রতপালনের কথা বলেছেন। পালনীয় ব্রতগুলি[৭] সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত এইরূপ ঃ—

সত্যব্রত ঃ

বিদ্যালাভের উপযুক্ত হবার জন্য ছাত্রদের 'সত্যব্রত' গ্রহণ করতে হবে। এই ব্রত পালনের জন্য ছাত্ররা কায়মনোবাক্যে মিথ্যাকে দূরে রাখবে। তারা প্রথমত সত্যকে জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তারপরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণা করবে।

অভয়ব্রত ঃ

এই ব্রত পালনের দ্বারা ছাত্ররা জানবে ধর্মকে ছাড়া তাদের ভয় করবার কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না, কিছুই তাদের

৬। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ২৯; ৭। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ১৩

ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্ল চিত্তে প্রসন্ন মুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে তারা নিজেদের নিযুক্ত রাখবে।

পুণ্যব্রত ঃ

এই ব্রতপালনের সাহায্যে ছাত্ররা অপবিত্র বস্তু ও কর্ম থেকে নিজেদের শরীর ও মনকে দূরে রাখবে। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে নিজেদের মনকে বিকশিত করতে থাকবে।

মঙ্গলব্রত ঃ

জ্ঞানলাভের জন্য নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করবার জন্য ছাত্রদের মঙ্গলব্রত গ্রহণ করতে হবে। এই ব্রতপালনের দ্বারা ছাত্ররা বাধা-বিরোধ অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করবে। প্রয়োজন হলে অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবে। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ বিপ্লবকে জয় করবে। যাতে পরস্পরের মঙ্গল হয়—তাই হবে ছাত্রদের চেষ্টা এবং ঐজন্য তারা নিজেদের সুখ এবং স্বার্থ বিসর্জন দেবে।.

স্বদেশব্রত ঃ

ছাত্রদের 'স্বদেশব্রত' গ্রহণ করে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ হতে হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা, এমন কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারি না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল, সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থ ভাবে

বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না, অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছুই নহে।”

ব্রহ্মচর্যব্রত ঃ

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বনের প্রয়োজন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। এই ব্রতকে তিনি ‘ধর্মব্রত’ বা ‘ব্রহ্মব্রত’ও বলেছেন।

তিনি বলেছেন,—

“আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।”[৮]

এই ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য শিক্ষার্থীকে মনে, বাক্যে ও কর্মে সংযমী হতে হবে। এইজন্য শিক্ষার্থীকে বিশেষ কয়েকটি নিয়ম অনুশীলন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত নিয়মগুলি উল্লেখ করেছেন।

ত্যাগ ও সংযম ঃ

ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের জন্য ছাত্রদের বিলাস ত্যাগ ও আত্ম-সংযমের ভেতর দিয়ে কাঠিন্য অভ্যাস করতে হবে। ধনাভিমান পরিত্যাগ করতে হবে। বিদ্যাশিক্ষা কালে ছাত্রদের মন থেকে ধনের গৌরব একেবারে নষ্ট করতে হবে। বেশভূষা সম্পর্কে বিলাসিতা একেবারে পরিত্যাগ করতে হবে। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে ছাত্ররা যেন দারিদ্র্যকে লজ্জাজনক ও ঘৃণাজনক মনে না করে।

নিষ্ঠা ঃ

উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা এবং শুচিতা সম্পর্কে সমস্ত নিয়ম ছাত্রদের পক্ষে একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে

৮। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ৩৬

পালনীয়। ঘরে, বাইরে, শয্যায়, বসনে ও শরীরে কোন প্রকার মলিনতা যেন ছাত্ররা প্রশ্রয় না দেয়। যথাসম্ভব নিজেদের দৈনন্দিন কর্ম ছাত্ররা যেন নিজের হস্তে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে।

ভক্তি ঃ

অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচার ভক্তি থাকা চাই। তাঁরা অন্যায় করলেও তা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে ছাত্রদের সহ্য করা উচিত। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত হওয়া চাই।

প্রার্থনা ঃ

ব্রহ্মচারীর জীবনে প্রার্থনার মূল্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। ছাত্ররা যখন প্রার্থনা করবে তখন তারা যেন মনে রাখে—"একই ব্রহ্ম সকলের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই অবস্থান করছেন। আমাদের সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে,—আমাদের সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই সকলের একমাত্র ভয় এবং তিনিই সকলের একমাত্র অভয়। ছাত্রদের উচিত প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে চিন্তা করা।"

বিদ্যালাভের জন্য ছাত্রদের কায়মন ও বাক্যে প্রস্তুত হবার প্রয়োজন আছে—এ নীতিটি ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এ নীতিতে বিশেষভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদগণ এ বিষয়টি তেমন উপলব্ধি করেন নি। তাঁরা ছাত্রদের যোগ্যতা, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিদ্যালাভের জন্য ছাত্ররা যে একটা লৌহদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করবে—এ বিষয়টি তেমন বলেননি। বিদ্যালাভের জন্য ছাত্রদের পক্ষেও যে সাধনার প্রয়োজন আছে—এ জিনিসটি তেমন লক্ষ্য করেননি। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদদের পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বলাভকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। এ মনুষ্যত্বলাভ তো সহজ জিনিস নয়। "মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে।"

এইজন্য সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাতের ভিতর দিয়ে মানুষকে যাত্রা করতে হয়; প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে মানুষকে ধাবিত হতে হয়। ক্লেশকে বরণ করে নিতে হয়, সুখ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়ে মানুষকে তরণী বেয়ে নিতে হয়—কারণ মানুষ মহৎ, কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বগুরু রবীন্দ্রনাথ 'শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যে উপদেশ বাণী ঘোষণা করেছিলেন,—তাকে আমরা বিশ্বের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কবিগুরুর আহ্বান-বাণী বলে উল্লেখ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে; সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন—এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।"[১]

বিদ্যালাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ যেমন কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানু-বর্তিতার কথা বলেছেন,—তেমনি তিনি ছাত্রদের শরীর ও মনের বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজনও স্বীকার করেছেন। এই বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই প্রয়োজন আছে মানুষের বিকাশের জন্য। প্রাণের লক্ষণ বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির জন্য চাই স্বাধীনতা, তেমনি বাইরের জগতের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য চাই শৃঙ্খলা। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে দুটিরই প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। কারণ, 'প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে বিদ্যালাভ করা যায় তা' কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।'

১। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম—পৃঃ ১১

এইজন্য শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রদের উপর তাদের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তিনি ছাত্রদের একটি শৃঙ্খলার মধ্যে এনে তাদের অবাধ স্বাধীনতা দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। ... আমি ছেলেদের বললাম, 'তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।'"[১০]

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সফল করতে হলে এরূপ 'ছাত্র-সম্মিলনী'র প্রয়োজন আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'Self Government in School.' অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশি এই পদ্ধতিকে বলেছেন—'ছাত্র স্বরাজ'। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষাকে কেবল পুঁথিপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। ছাত্রদের ব্যবহারকে, চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি দেশের শাসন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে থাকি, তবে তার ভিত্তি পত্তন করতে হবে বিদ্যালয়ে।

এই বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেছি, লোকহিত ও স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার,—সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন ঐটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে।"[১১]

ছাত্রদের ব্যবহার ও চরিত্র আমাদের বৃহৎ সমাজ-জীবনের অনুকূল করে গড়ে তোলা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য-সাধনের জন্য বিদ্যালয়ে 'ছাত্র স্বরাজের' প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

১০। বিশ্বভারতী—পৃঃ ২৮, ১১। রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ৪৩

বিদ্যালয়ের সকল কাজে ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে কাজ করবে—এইটাই রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল। ছাত্রদের 'সহযোগিতার সভ্য নীতি'তে সচেতন করে তোলাও আমাদের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল—সহযোগিতার সখ্য বিস্তারে সকলে মিলে আশ্রমের সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করবে; তাতে করে আশ্রম হবে আশ্রম কর্মীদের নিজহাতের সম্মিলিত রচনা, কর্ম-সমবায়ে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে তিনি সতত এই উদ্যমশীল কর্মসহযোগিতা কামনা করেছেন। কারণ, সকলের সঙ্গে একত্রে কর্মে অভ্যাস জন্মালে আমরা পরস্পরের সঙ্গে একত্রে সুস্থভাবে বাস করতে পারি।

এই জন্য তিনি বলেছেন,—

"আপনার চারিদিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করে তোলা চাই। একজনের শৈথিল্যে অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে—এই বোধটি সভ্যজীবন যাত্রার ভিত্তিগত।"[১২]

ছাত্র স্বরাজের অন্যতম লক্ষ্য ছাত্রদের আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ প্রদান করা। এর ফলে তারা যেমন পরস্পরের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে শেখে, তেমনি তাদের মনের সৃষ্টিকর্তৃত্বেরও বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্রদের উপর যথাসম্ভব কর্তৃত্ব অর্পণ করা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন,—

"আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে দমন করা হয়। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি দাবীর আবদার তাদের বেড়ে যায়, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে, আর পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ

১২। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ১৩

করে। এই লজ্জাকর দীনতা চারিদিকেই সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই। ছাত্রদের স্পষ্ট বোঝা উচিত, যেখানে নালিশ কথায় কথায় মুখর হয়ে ওঠে সেখানে সঞ্চিত আছে নিজেরই লজ্জার কারণ, আত্মসম্মানের বাধা। ত্রুটি-সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁত খুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্‌কার বোধ করে।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের স্বাধীন ভাবে কাজ করার চিন্তা করার স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন। এই ছাত্রজীবন যেমন ব্রহ্মচর্যের কঠোর বাঁধনে বাঁধা, তেমনি এ আপন কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি শরীর মনের পূর্ণ বিকাশ বোঝায়, তা হলে, যেরূপ সুযোগের সাহায্যে এটি সম্ভব, বিদ্যালয়ে তার স্থান করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন শিশুদের মনের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাদের একটু অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে বাড়তে দেওয়া ভাল। এতে করে তাদের শক্তি পরিপূর্ণ ভাবে কাজে নিযুক্ত হবার সুযোগ পায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত এই যে "আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভাল। অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পে, অনায়াসে প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। ছেলেরা সাধারণতঃ সহজেই কিছু চায় না। তারা আত্মতৃপ্ত। বয়স্কেরা চাওয়াটা কেবলি তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশাগ্রস্ত করে তুলি।"[১৪]

বাল্যকাল থেকেই ছাত্রদের সহযোগিতার সভ্যনীতিতে যেমন সচেতন করে তোলা দরকার, তেমনি দরকার তাদের আত্মকর্তৃত্ববোধ জাগানো। এইজন্য শিক্ষার প্রথম অবস্থায় উপকরণ লাঘব অত্যাবশ্যক। কারণ,—

"শরীর মনের সম্যক্‌রূপে চর্চা সেইখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার

১৩। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ১৫, ১৪। ঐ —পৃঃ ১৬

সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে তাদের আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়।

"আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে মেয়েদের হাতে অতি লালিত ছেলেরা মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে অন্যদের ইচ্ছার নমুনায় রূপ নেবার জন্যে অত্যন্ত কাদামাখা ভাবে প্রস্তুত। তাই অফিসের নিম্নতম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।"[১৫]

শিক্ষাক্ষেত্রে এই উপকরণ লাঘবের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ অন্যদিক থেকেও আলোচনা করেছেন।

বাল্যকালে অনাবশ্যক উপকরণের মধ্যে আমরা অত্যন্ত বস্তু-পরায়ণ হয়ে পড়ি এবং এর ফলে আমাদের চিত্তবৃত্তির স্থূলতা জন্মে। আমাদের মনের পরিপূর্ণ বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। আমরা অত্যন্ত বস্তুনির্ভর হয়ে পড়ি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য ও সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকে। রচনা শক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বিচিত্র উপকরণকে সুবিহিতভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ উপযুক্ত বয়সে ও অবস্থায় লাভ করবার সুযোগ অনেকের ঘটতে পারে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্ম-শক্তিমূলক শিক্ষাটা আমাদের দেশে উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু সামগ্রী যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে সুন্দর করে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা বিধানের কর্তব্যে ছাত্ররা যেন আনন্দ পেতে পারে এই আমার কামনা।"[১৬]

১৫। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ১৭, ১৬। ঐ —পৃঃ ১৪

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিজেদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া প্রকৃত শিক্ষার দিক থেকেও প্রয়োজন। শিক্ষার প্রথম থেকেই ছাত্রদের নানা কাজে দায়িত্ব দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন ছাত্রেরা নিজেদের 'সম্মিলনী' গঠন করে পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে এই দায়িত্ব পালন করবে। এই 'ছাত্র সম্মিলনী'র উদ্দেশ্য সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণনা করা যেতে পারে।

(১) দেশের বৃহত্তর লক্ষ্যকে ছাত্রদের দ্বারা বিদ্যালয়ের ছোট সীমার মধ্যে পরীক্ষা করা এবং জাতীয় আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করা।

(২) ছাত্রদের সহযোগিতার সভ্যনীতিতে সচেতন করে তোলা।

(৩) ছাত্রদের আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ প্রদান করা, যাতে করে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে।

(৪) আলস্য, অনৈপুণ্য ও বস্তুলুব্ধতা থেকে ছাত্রদের মনকে মুক্ত করে, তাদের রচনাশক্তিকে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া।

(৫) বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।

রবীন্দ্রনাথ উক্ত লক্ষ্য সাধনের জন্য শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে 'আশ্রম সম্মিলনীর' প্রবর্তন করেছিলেন। সোভিয়েট দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিদর্শনে গিয়ে সেখানে উক্ত পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন দেখে খুশী হয়ে তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে সুন্দর একটি বিবরণ দিয়েছেন।

"একটি মেয়ে বললে, 'আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য।'

"আর একটা ছেলে বললে, 'আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোটো ছেলেমেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয়, এবং তারা যেতে পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে।'

"আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম,—'কেউ কোনো অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কী।'

"একটি মেয়ে বললে,—'আমাদের কোনো শাসন নেই, কেন না আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।'

"আমি বললুম,—'আর একটু বিস্তারিত করে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাক। নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্বাচন কর। শাস্তি দেবার বিধিই বা কী রকমের

"একটি মেয়ে বললে,—'বিচার সভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।'

"একটি ছেলে বললে,—'সেও দুঃখিত হয়, আমরাও দুঃখিত হই, বাস চুকে যায়।'

"আমি বললুম,—'মনে করো, কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অযথা দোষারোপ হচ্ছে তা হলে তোমাদের উপরেও আর কারো কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে।'

"ছেলেটি বললে,—'তখন আমরা ভোট নিই। অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তা হলে তার উপরে আর কথা চলে না।'

"আমি বললুম,—'কথা না চলতে পারে, কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশই তার উপরে অন্যায় করছে তা হলে তার কোনো প্রতিবিধান আছে কি

"একটি মেয়ে উঠে বললে,—'তা হলে হয়তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই,—কিন্তু এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি।"

"আমি বললুম,—যে একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছো সেইটেতেই আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।"

উপরের বিবরণে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের 'স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা'র যে উদাহরণ দিয়েছেন—শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে তাই

প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারেও তিনি ছাত্রদের উপর ভারার্পণ করতে চেয়েছেন। কোন ব্যাপারেই তিনি কঠোর শাসনের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্রতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাতন্ত্রেই কী, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।"

প্রকৃত গুরু ছাত্রজীবনের রহস্যটি ঠিক ধরতে পারেন। তিনি দেখেন, "ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণ-কোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই—তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা।

"সেই জন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে উর্ধ্বের দিকে উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণ রেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা ছাত্রদের পদে পদে অবজ্ঞা করতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদের শ্রদ্ধা না করলে তাদের নিকট থেকে ভক্তি কেউ সহজে পায় না।

ছাত্রদের কড়া শাসনের জালে যারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত বেঁধে ফেলতে চান, তারা অধ্যাপকদেরও বড়ো ক্ষতি করেন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্ররা যদি মানব-স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়, সকল প্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সয়ে যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপককেই তা অধোগতির দিকে নিয়ে যাবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজেরাই সৃষ্টি করে অবমাননার দ্বারা তাঁরা নিজেদেরই অহরহ অবমানিত করবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনই কেউ সাধন করতে পারে না।[১৭]

১৭। শিক্ষা—পৃঃ ২১২

বিদ্যালয়, সমাজ ও পরিবেশ

মানুষ সামাজিক জীব এবং বিদ্যালয় আমাদের সমাজ-জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ (Institution)। সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যে সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ নির্ধারণ করেছেন সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

মানুষ নিজের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। কোন কোন প্রাণীরাও করে। কিন্তু মানুষের সমাজ এবং প্রাণীর দলবদ্ধ হয়ে বাস করার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাণীর প্রয়োজন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ,—কিন্তু মানুষ তার আপন প্রয়োজনের ঊর্ধ্বেও তার মনকে স্থাপন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"The most important distinction between the animal and man is this, that the animal is very nearly bound within the limits of its necessities, the greater part of its activities being necessary for self-preservation and the preservation of race. Like a retail shopkeeper it has no large profit from its trade of life. ······ Most of its resources are employed in the mere endeavour to live. But Man, in life's commerce, is a big merchant. He earns a great deal more than he is absolutely compelled to spend." (What is Art ?)[১]

মানুষের মনের সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ এই সমাজে বাস করার জন্যই সম্ভব হয়েছে। জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য মানুষ সকলে মিলে এক সঙ্গে সমাজের কাজকে ভাগ করে নিয়েছে। এর ফলেই সামাজিক মানুষ তার বেঁচে থাকবার চেষ্টার মধ্যেও প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে, নূতন শিল্পকলা সৃষ্টিতে আপনাকে নিযুক্ত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self-preservation. This

১। *Personality*—Page 9

surplus seeks its outlet in the creation of Art, for man's civilization is built upon his surplus."[২]

মানুষের সমাজ মানুষের সৃষ্টিধর্মের (Creative Instinct) ফল। বৃহত্তর সৃষ্টির মাঝে যেমন বৈচিত্র্য আছে, বিশেষ গুণ আছে, ধর্ম আছে, মানুষের সমাজের মাঝেও ঐগুলির স্থান আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে যেমন সঙ্গতি আছে, নিয়ম আছে,—মানুষের সমাজের মধ্যে তেমনি বৈজ্ঞানিক সঙ্গতি বা নিয়মের স্থান আছে। সৃষ্টি যেমন তার বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ,—সমাজও তেমনি সম্পূর্ণ তার বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও কার্যপ্রণালী আলোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এটি মানুষের সৃষ্টিক্ষমতার সর্বোত্তম প্রকাশ।

সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত এই যে, সমাজ মানুষের সৃষ্ট হলেও, মানুষ এর নানা প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে যেন আপনাকে চাপা দিয়েছে।"[৩] মানুষ সমাজকে প্রকাশ করেছে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে, যেমন,—রাষ্ট্র ধর্ম, নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যে, কিন্তু মনে হয় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানই প্রাধান্য লাভ করেছে মানুষকে অন্তরালে রেখে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের সত্যকে প্রকাশ করে, এবং প্রকাশের মধ্য দিয়েই মানুষ আপন সত্যকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে।"[৪] মানুষ জীবনের প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করে দুইভাবে আপনাকে সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছে। মানুষ সমাজের মধ্যে যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি আবার সকলের সঙ্গে যুক্ত। 'মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবন

২। *Personality*—Page 11

৩। Man's social world is like some nebulous system of stars, consisting largely of a mist of abstractions, with such names as society, state, nation, commerce, politics and war.—*Ibid*—Page 36

৪। *Creative Unity* (The Poet's religion)—Page 23

ধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হতে হয়।'[৫]

মানুষের মধ্যে এই জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়েরই প্রভাব রয়েছে। কিন্তু মানুষ যতই উন্নততর আদর্শের বশবর্তী হয়ে সমাজকে উন্নত করছে, ততই সে তার জীবধর্মকে খর্ব করছে এবং সমাজধর্মকে প্রধান স্থান দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন,—"ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি ; কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিম প্রবৃত্তি খর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমন কি, সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবনধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।"[৬]

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি জীবের প্রধান লক্ষ্য বিকশিত হওয়া। এই বিকশিত হবার জন্য চাই সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা। এই বিকাশ ক্ষুণ্ণ হলেই জীবের মৃত্যু হয়। ডিউই-এর মতে এই বিকাশের নানা পদ্ধতি আছে। আপন শরীর ও মনের বৃদ্ধির দ্বারা মানুষ বিকশিত হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধির (Growth) একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। শরীর ও মনের বৃদ্ধির ফলে মানুষের শক্তির যদি পূর্ণ প্রকাশ হয়, তবেই তাকে আমরা মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলতে পারি।

এখন সমাজ কি ভাবে মানুষকে এই বিকাশে সাহায্য করতে পারে? আমরা দেখেছি মানুষকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত হবার জন্য আপনার স্বাধীনতাকে বহুল পরিমাণে খর্ব করতে হয়।

কি ভাবে সমাজ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কিছু অংশে খর্ব করেও, ব্যক্তিকে বিকাশের দিকে নিয়ে যেতে পারে—এই জটিল প্রশ্নের

৫। ধর্ম—পৃঃ ১২৮, ৬। ঐ—পৃঃ ৪৮

সমাধানের জন্য আমাদের অন্যভাবে এই বিষয়টির আলোচনা করতে হবে।

আমরা বলেছি সমাজ মানুষের সৃষ্টি-প্রতিভার এক সর্বোত্তম প্রকাশ। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের মতে মানুষ নিজের প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করলেও, সে সমাজের নিয়ম, নীতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করে বেঁচে থাকে। কারণ, সমাজ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ ও অনুশাসন মানুষকে উন্নত করবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সমাজ ব্যক্তিসমূহের সমষ্টি মাত্র নয় কিংবা ব্যক্তি সমাজের একটি অংশ মাত্র নয়। সমাজ বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টি অপেক্ষা আরও বেশি। কারণ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, বস্তুর সঙ্গে তার অংশ বিশেষের সম্পর্কের মতো সাধারণ ভাবে যুক্ত নয়। যদিও আমরা জানি যে ব্যক্তির মঙ্গলের কথা না ভেবে সমাজের মঙ্গলের কথা ভাবা যায় না, কিংবা ব্যক্তির লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে সামাজিক লক্ষ্যের চিন্তা অবান্তর। ব্যক্তির সমবায়ে সমাজ গঠিত হলেও, সমাজের সত্তা নির্ণয়ে আমাদের ভাবতে হবে—যে, সমাজ-সৃষ্টিতে বিভিন্ন ব্যক্তি নানা প্রকার জটিল সম্পর্ক ও নিয়ম অনুযায়ী মিলিত হয়েছে এবং এই মিলন একটি বিশেষ লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিধি বিধানের সাহায্যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এবং বিধিবিধানের লক্ষ্য মানুষকে সফলতার দিকে, জীবনের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া। যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মানুষ আপনাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, সেগুলিকে হেগেলীয় দার্শনিকগণ 'সৎ প্রতিষ্ঠান' (Rational Institution) বলেছেন।

কিন্তু মানুষের জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তনশীল। এই কারণে পূর্বে যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে,—তা পরবর্তী কালে লক্ষ্যসাধনে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে এই বিষয়টির অনেক উদাহরণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি অন্যভাবে বলেছেন,—

"আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল individualism, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কিন্তু, সে তো কোনো ছোটো খাটো স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একেবারে মুক্তিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতি দিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, সেই মুক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেমনি নিয়ম সংযমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তির পরিণামকে লক্ষ্য হইতে বাদ দিয়া যদি কেবল নিয়ম সংযমকেই একান্ত করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়, আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা বড়ো বেশি।

"আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখি পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনও নানাবিধ বাঁধাবাধি মানিয়া চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে, আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি।"[৭]

অর্থাৎ আমাদের সমাজগঠনের রূপটি বুঝতে হলে এই নিয়মের দিকটিও বুঝতে হবে। ভারতীয় সমাজের প্রারম্ভে যে নিয়মবন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সাধন করা, আজ সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সেই পুরাতন নিয়ম,—শৃঙ্খলের মতো মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ করে খর্ব করেছে। আমাদের সমাজের জাতি-ভেদ, লোকাচার, কুধর্ম এবং কুসংস্কার সামাজিক বিধিনিয়মের ছদ্মবেশে মানুষের মনকে পঙ্গু করে, তার আপন স্বাধীনতাকে নষ্ট করছে।

৭। ধর্ম—পৃঃ ১৩৭

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Creative Unity' পুস্তকে এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিয়েছেন।

"For instance, the caste-idea is a collective idea in India. When we approach an Indian who is under the influence of this collective idea, he is no longer a pure individual with his conscience fully awake to the judging of the value of a human being. He is more or less a passive medium for giving expression to the sentiment of a whole community.

"It is evident that the caste-idea is not creative; it is merely institutional. It adjusts human beings according to some mechanical arrangement. It emphasises the negative side of the individual—his separateness. It hurts the complete truth in man."[৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে,—নিজের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এবং ঐ কারণেই সমাজের মধ্যে নানা প্রতিষ্ঠান ও নিয়মের প্রবর্তন করেছে। সুতরাং সমাজ মানুষের বুদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি না করে তাকে পূর্ণতার দিকে চালিত করতে পারে যদি সমাজের যে নিয়ম মানুষকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে তাকে মানুষ অতিক্রম করতে পারে। এইজন্যই সামাজিক মানুষকে বলা হয় সভ্য মানুষ। কারণ, সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে মানুষ আপনার সার্থকতা লাভ করে। এইজন্য "সভ্যতা শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা, যেখানে আলো আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন।"[৯]

৮। *Creative Unity*—Page 96, ৯। শান্তিনিকেতন—পৃঃ ৬৩০

কিন্তু সমাজের মধ্যে সকলের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে নিজেকে পূর্ণতার দিকে চালিত করা সহজ কথা নয়। এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। এই দ্বন্দ্ব জীবধর্ম ও সমাজধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের দ্বন্দ্ব ; এই দ্বন্দ্ব সামাজিক কু-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অতিক্রম করে ব্যক্তিকে বিকাশের দিকে চালিত করার দ্বন্দ্ব।

শিশুর বৃদ্ধির পক্ষে মানসিক দ্বন্দ্ব যেমন অপরিহার্য, তেমনি এই দ্বন্দ্বের স্থান রয়েছে সামাজিক মানুষের জীবনেও। জীবধর্ম ও সমাজ-ধর্মের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে তার মাঝে একটা সামঞ্জস্য আনবার। মানুষ আপনার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে সমাজবন্ধনের বাইরে যেতে, সমাজের যে নিয়ম তাকে বাধা দিচ্ছে তাকে অতিক্রম করতে ; আবার অন্যভাবে সামাজিক স্বার্থের জন্য, সমষ্টির মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থকে খর্ব করে মানুষ সামাজিক নিয়মকে মেনে নিচ্ছে। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং বন্ধনের লোভ—এই দুইএর জোরেই মানুষের স্বধর্মের বিকাশ হয়।

কি করে নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা মুক্তির দিকে পা বাড়াতে পারি, রবীন্দ্রনাথ একটা উদাহরণের সাহায্যে সুন্দর করে তা বলেছেন।

"শিশু বলে আমি পা ফেলে চলব ; কিন্তু যতক্ষণ বহুসাধনায় সে চলার নিয়মটিকে পালন ক'রে ভারাকর্ষণের সঙ্গে আপন সামঞ্জস্য করতে না পারে ততক্ষণ তার আর উপায় নেই, শুধু বললেই হবে না, আমি চলব।

"এই চলার নিয়মকে শিশু যখন গ্রহণ করে এ নিয়ম তখন তাকে পীড়া দেয় না। শুধু পীড়া দেয় না তা নয়, তাকে আনন্দ দেয় ; সত্য নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করবামাত্র শিশু নিজের গতিশক্তিকে লাভ করে আনন্দিত হয়।

"এমনি করে ক্রমে ক্রমে যখন সে জলের সত্য, মাটির সত্য, আগুনের সত্যকে সম্পূর্ণ মানতে শেখে তখন যে তার কতকগুলি

অসুবিধা দূর হয় তা নয়, জল, মাটি, আগুন সম্বন্ধে তার শক্তি সফল হয়ে উঠে, তাকে আনন্দ দেয়।

"শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে উঠবার জন্য বিস্তর সাধনা করতে হয়, তাকে বিস্তর নিয়ম স্বীকার করতে হয়, তাকে অনেক রকম আবদার থামাতে হয়, অনেক রাগ কমাতে হয়, নিজেকে অনেক রকম করে বাঁধতে হয় এবং অনেকের সঙ্গে বাঁধতে হয়। যখন এই বন্ধনগুলি মানা তার পক্ষে সহজ হয়, তখন সমাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের হয়ে ওঠে,—তখনি তার সামাজিক শক্তি সেই সকল বিচিত্র নিয়ম বন্ধনের সাহায্যেই বাধামুক্ত হয়ে স্ফূর্তি লাভ করে।"[১০]

সুতরাং মানুষের পক্ষে সমাজের বন্ধনকে মেনে নেওয়া তার মুক্তির পরিপন্থী নয়। এই নিয়মের মধ্যে ধরা দিয়েই মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে। যতই মানুষ সমাজবন্ধনের ভিতর ধরা দেয়, ততই সে আপন স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে আপনাকে বিশ্বের সঙ্গে বিস্তৃত করে। সে আপনাকে নিজের স্বার্থ থেকে পরিবারের স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থ থেকে দেশের ও জাতির স্বার্থে এবং পরে বিশ্বমানবের স্বার্থে নিয়োজিত করে। মানুষের মাঝে এই যে বিকাশের চেষ্টা,—তার সাহায্যেই মানুষ আপনার চরিতার্থতা লাভ করে।

তাঁর 'শান্তিনিকেতন' পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি অন্যভাবে সুন্দর করে বলেছেন,—

"মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহঙ্কার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে, তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে,—তখনই সে বড়ো হতে সুরু করে। কিন্তু সেই বড়ো হবার মূল্যটি কি? নিজের প্রকৃতিকে, বাসনাকে, অহঙ্কারকে খর্ব করা। এ না হোলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না;

১০। শান্তিনিকেতন—পৃঃ ৫৬

গৃহের সকলের কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হোতে পারা যায়।

"এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে, স্বাদেশিক হবার জন্যে মানুষকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে সকল প্রকৃতি নিজেকে বড়ো করে পরকে আঘাত করে, তাকে কেবলি খর্ব করতে হয়, তার যে সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ একদিকে যতই বড়ো হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়, ততই শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হয়।"[১১]

উপরের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই বলতে চেয়েছেন যে 'পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়াই স্বাতন্ত্রে যাইবার পথ।' কথাটা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই 'স্বাতন্ত্রে'র অর্থ দেশভেদে, সমাজভেদে বিভিন্ন। য়ুরোপ যে ভাবে এই 'স্বাতন্ত্রে'র অর্থ করেছে,—ভারতবর্ষ তা করেনি। য়ুরোপে স্বাধীনতার গৌরব খুব বেশি। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করবার স্বাধীনতা, ভোগ করবার স্বাধীনতা, কাজ করবার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা খুব বড়ো জিনিস সন্দেহ নেই। এই সংসারে এই স্বাধীনতাকে বজায় রাখতে অনেক শক্তি ও আয়োজন আবশ্যক হয়।

কিন্তু ভারতবর্ষ তার লক্ষ্যকে এই 'স্বাধীনতা'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায় নি। ভারতবর্ষ আরও বেশী চেয়েছে,—এই স্বাধীনতাকেও অতিক্রম করতে চেয়েছে। এই ভোগের স্বাধীনতা, বস্তুর স্বাধীনতাকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা বলে স্বীকার করতে চায় নি। ভারতবর্ষ কামনার উপরে, কর্মের উপরেও স্বাধীন হতে চেয়েছে। এই স্বাধীনতার জন্যই মানুষ সমাজ গঠন করেছে,—ভারতবর্ষে সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য।

১১। শান্তিনিকেতন—পৃঃ ৩৭৮

উপনিষদ বলেছেন,—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ',—অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন জানিবে। উপনিষদের এই শিক্ষা গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন-নির্ব্বাহের গোড়াকার কথা।"[১২]

কিন্তু মানুষ সমাজের উপযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তাকে সাধনার দ্বারা নিজের স্বার্থকে, বাসনাকে খর্ব করে সমাজের উপযুক্ত হতে হয়। প্রাচীন কালের সমাজ-ব্যবস্থা বর্তমানের মত জটিল ছিল না, সুতরাং সেকালে সমাজের মধ্যে বাস করেই মানুষের পক্ষে সামাজিকতা-বোধ অর্জন করা সহজ হতো।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা বড়ই জটিল,—এইজন্য মানুষকে সমাজের উপযুক্ত হবার জন্য বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এই কারণেই আমরা সমাজে আলাদা করে বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। সমাজ-ব্যবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ মানুষকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। কিন্তু এই কাজটি খুব সহজ নয়। কারণ আমাদের সমাজের একটি সাধারণ প্রকৃতি থাকলেও, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং জাতীয় নানাবিধ জটিলতার জন্য মানুষকে ঠিক মতো গড়ে তোলা কঠিন। সমাজ-ব্যবস্থা চিরকাল মানুষকে একটি পরম ঐক্যের দিকে চালিত করে,—কিন্তু বর্তমানে সমাজের জটিলতার জন্য এই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। বর্তমান সমাজের মধ্যে পরস্পর স্বার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম এবং শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত রয়েছে।

সমাজের মধ্যে এইরূপ পরস্পর বিরোধী স্বার্থের অবস্থিতির জন্যই, সমাজ মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্যের দিকে চালিত করতে পারে না; বরং ক্ষুদ্র স্বার্থের জালে আবদ্ধ করে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।

১২। ধর্ম—পৃঃ ১৪০

সামাজিক নানাবিধ অনৈক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য, সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা বাধা সৃষ্টি করে, বিদ্যালয় সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে থেকে ব্যক্তিকে ঐ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে এবং ব্যক্তির বিকাশের অনুকূলে একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই নূতন পরিবেশের প্রভাবেই ব্যক্তি নিজেকে সামাজিক দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে স্থাপন করে,—এবং নিজেকে মহত্তর সামাজিক লক্ষ্যের উপযুক্ত করে গঠন করে।

এই প্রসঙ্গে ডিউই-এর মত এই যে, আমরা এমন এক সমাজের মধ্যে বাস করি যেখানে বহু সমাজের প্রভাব রয়েছে। অর্থাৎ আমরা বহু সমাজের মধ্যে বাস করি। এই পরস্পর বিরোধী স্বার্থের প্রভাব শিশুর বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয় বলেই, সমাজে বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে একটি বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্যার পারসি নান বিদ্যালয়ের সামাজিক রূপটি অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন,—

"The school must be a society, it must be a society of special character. It must be a natural society in the sense that there should be no violent break between the conditions of life within and without it. ······But on the otherhand a school must be an artificial society in the sense that while it should reflect the outer world truly, it should reflect only what is best and most vital there".[১৩]

মানুষ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে—সমাজের এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কিন্তু সামাজিক সর্বপ্রকার গুণ থাকা সত্ত্বেও এই বিদ্যালয়ের পরিবেশে একটি কৃত্রিমতার ভাব আছে। শিশুর জীবনে এই কৃত্রিমতা অনেক ক্ষেত্রে দুঃখজনক। এই কৃত্রিমতার জন্য বিদ্যা-

১৩। Sir Percy Nunn: *Education, its data and First Principles*—Page 250

শিক্ষা শিশুর জীবনে সমাজ থেকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে মনে হয়।

এই বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"আমাদের গৃহ এক জায়গায়, বিদ্যালয় আর এক জায়গায়; প্রয়োজনের খাতিরে গৃহের সঙ্গে শিক্ষার এই বিচ্ছেদ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে মস্ত একটা দুঃখ আছে। সুতরাং এই বিধানকে কোন মতেই আমরা চরম বলে স্বীকার করে নিতে পারিনে। আমাদের বলতেই হবে যে, শিশুশিক্ষার সমস্যা মানুষের মধ্যে ঠিক মতো সমাধান করা হয় নাই। তাই স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধে আমাদের যেতে হয়েছে। পাখীর ছানা নীড়ের মধ্যে পক্ষি-মাতার কাছেই তার প্রথম শিক্ষা পায়। সেই শিক্ষায় তার আনন্দ। মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়। সেই কান্নায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর প্রতিবাদ রয়েছে।"[১৪]

সমাজে বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকলেও শিশুমনের নিকট গৃহের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। গৃহের পরিবেশই শিশুর আপন পরিবেশ এবং এই জন্যই গৃহের পরিবেশই শিশুকে আপন ধর্মে বিকশিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের নিকট গৃহের একটি চিরন্তন আবেদন আছে—এবং এর ফলেই গৃহের পরিবেশে মানুষ আপনাকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করতে পারে।

এই গৃহের 'তাৎপর্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"The permanent significance of home is not in the narrowness of its enclosure, but in an eternal moral idea. It represents the truth of human relationship ; it reveals loyality and love for the personality of man".[১৫]

একটি উজ্জ্বল ভালবাসার বেষ্টনী গৃহকে মাধুর্যমণ্ডিত করে রাখে। বিদ্যালয়ে শিশু এটির বড়ই অভাব বোধ করে। মায়ের ও আত্মীয়-

১৪। শান্তিনিকেতন—পৃঃ ৬০১, ১৫। *Creative Unity*—Page 165

পরিজনের স্নেহভালবাসার মধ্যে গৃহ শিশুর মনকে বিকশিত করে, যেমন উজ্জ্বল প্রত্যুষে সূর্যের নবীন কিরণ স্পর্শে পুষ্পকলি পুষ্পে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু নানা কারণে আমাদের সমাজে তেমন গৃহের অভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে, একথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়।"

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, তেমন আদর্শ গৃহ আমাদের সমাজে নেই—যে গৃহের পরিবেশে শিশুর সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব হতে পারে।

"সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর কিছু। ইঁহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

"জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকার-প্রকার লইয়া মানুষ এক-একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নয়।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,—

"ধনীর ছেলে ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

"এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যক মতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না। সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে

শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে—ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়।”[১৬]

ধনীর ঘরে ছেলেমেয়েকে একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে মানুষ করা হয়। “বদ্ধ-ডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে, হাত পা সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন।”

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন,—বাল্যকাল থেকেই লোকলজ্জার ভয়ে ধনীর ছেলে যে কেবল অনাবশ্যক শাসনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তা নয়, সে সুখ ভোগের লোভে নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলি এমন ভাবে বাড়িয়ে তোলে যে ভবিষ্যতে তার পক্ষে ত্যাগ স্বীকার অসাধ্য হয়, কষ্ট স্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তীব্রভাবে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন,—“তবু কি বলিতে হইবে—এই সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী। যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়—কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধুলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়া বোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ—নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই—তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতা-মাতার দ্বারাই সম্ভব; সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।”[১৭]

১৬। রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যে ব্যক্তির জীবনে বংশের প্রভাব ও পরিবেশের প্রভাব এই দুইয়ের মধ্যে পরিবেশের প্রভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে এই বিষয়টি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষাবিদদের নিকট রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

১৭। শিক্ষা—পৃঃ ৬৩

আমাদের সমাজে মাতাপিতার শিক্ষার দোষে অনেক ছেলে নিজের দেশ ও জাতিকে যথাযোগ্য সম্মান করতে শেখে না। এইজন্য মাতা-পিতার শিক্ষা সকল সময়ে শিশুর পক্ষে হিতকর নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা-সমস্যা' নামক প্রবন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

"আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালক বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়। বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙ্গালীর ছেলে বাংলা সমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্ররস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়,—অথচ ইংরেজ সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে—Mamma, Mamma, look, lot of Babus are coming. বাঙ্গালীর ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে।

"বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রকৃতি-বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক। কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে—চেষ্টা করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে।"

আমাদের সমাজে যারা বিলাতী ভাবধারায় মানুষ হয়েছেন তারা নিজেদের ছেলে মেয়েদেরও ঐ ভাবে মানুষ করতে চান। তার কারণ এই যে এর ফলে তাদের ছেলেমেয়েদের কোন ক্ষতি হচ্ছে—এই জিনিসটি তারা তেমন বুঝতে পারেন না। আমাদের নিজেদের

মধ্যে যে সকল বিশেষ বিকৃতি আছে, তার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন। মাতাপিতা নিজেদের বিকৃত রুচি ও চিন্তার দ্বারা শিশুর মনুষ্যত্বলাভে বাধা সৃষ্টি করবেন—এটি বর্তমানে কোনক্রমেই ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়।

অনেকে মনে করেন,—পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার রোষ দ্বেষ, অন্যায় পক্ষপাত বিবাদ বিরোধ নিন্দাগ্লানি কু-অভ্যাস কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকলেও পরিবার থেকে দূরে যাওয়া ছেলেদের পক্ষে বিশেষ বিপদ। তার কারণ আমরা যার মধ্যে মানুষ হয়েছি তার মধ্যে আর কেউ মানুষ হলে ক্ষতি আছে—একথা আমাদের মনেও আসে না। এইজন্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আমাদের আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন।

বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে বলেছেন,—

"মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতোই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে একথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বর্তমান জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় নানা কারণে গৃহের আবহাওয়া শিশুদিগকে মনুষ্যত্বে পাকা করিবার পক্ষে অনুকূল নয়। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ শিশুর শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন।

শিশুকে মানুষ করবার জন্য যে বিশেষ পরিবেশের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন—তার তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই পরিবেশের প্রকৃতি সম্পর্কে ডিউই বলেছেন,—

"The environment consists of those condition that promote or hinder, stimulate or inhibit the characteristic activities of a living being. Water is the

environment of a fish because it is necessary to the fish's activities—to its life. ...... Just because life signifies not bare passive existence (supposing there is such a thing), but a way of acting, environment or medium signifies what enters into this activity as a sustaining or frustrating condition."[১৮]

সুতরাং শিশুর জন্য এমন পরিবেশ প্রয়োজন—যা শিশুকে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নানাভাবে সাহায্য করবে। আমাদের পরিবারও এমন একটি বেষ্টনী বা পরিবেশ, আমাদের সমাজও তাই। কিন্তু শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে পরিবার বা সমাজ যে সকল সময় অনুকূল নয় আমরা তা পূর্বে আলোচনা করেছি।[১৯]

আদর্শ গৃহ শিশুর বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্তমান জটিল সমাজ-ব্যবস্থায়—আদর্শ গৃহ অল্প শিশুরই ভাগ্যে জোটে। এই পরিবেশের জন্য রবীন্দ্রনাথ আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেছেন,—ডিউইও বলেছেন।

আদর্শ পরিবেশ শিশুর শরীর ও মনকে কি ভাবে বিকশিত করতে পারে—এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত আলোচনা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর Poet's School নামক প্রবন্ধে বলেছেন,—

Children have their active subconscious mind which, like a tree, has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them atmosphere is a great deal more important than rules and methods, buildings, appliances, class-teaching and text books."

১৮। Dewey—*Democracy and Education*—Page 14

১৯। এই প্রসঙ্গে ডিউই-এর নিম্নলিখিত মন্তব্যটিও আলোচনার যোগ্য :—

An intelligent home differs from an unintelligent one chiefly in that the habits of life and intercourse which prevail are chosen or at least coloured, by the thought of our bearing upon the development of children.

(*Ibid*—Page 12)

এই বিষয়টিই ডিউই তাঁর 'Democracy and Education' নামক গ্রন্থে অন্যভাবে বলেছেন। ডিউই বলেছেন,—

"By means of the action of the environment in calling out certain responses, the required beliefs can not be hammered in; the needed attitudes can not be plastered on. But the particular medium in which an individual exists leads him to see and feel one thing rather than another; it leads him to have certain plans in order that he may act successfully with others; it strengthens some beliefs and weakens others as a condition of winning the approval of the others. Thus it gradually produces in him a certain system of behaviour, a certain disposition of action."

শিশুশিক্ষার জন্য এই যে পরিবেশ—এ ঠিক চতুর্দিকের বেষ্টনী বা surrounding নয়। এই পরিবেশের অর্থ আরও গভীর। ডিউই-এর মতে পরিবেশ এমন জিনিস যা মানুষকে প্রভাবান্বিত করে, অর্থাৎ 'The things with which a man varies are his genuine environment.'

রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশের ব্যাখ্যা করেছেন—অন্যভাবে। তিনি পরিবেশের প্রকৃতি নির্ণয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করেছেন। তিনি বলেছেন,—"শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য—ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।"

কিন্তু মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য ভারতবর্ষের যে পরিবেশ, অন্য দেশের তা নয়। কারণ, ভারতবর্ষ তাঁর ভৌগলিক অবস্থানের জন্য তপোবন ও আশ্রমকে এই পরিবেশ হিসাবে গ্রহণ করেছে। অন্য জাতির পক্ষে এই পরিবেশের জন্য তাদের আপন আপন ভৌগলিক অবস্থান বিশেষ কার্যকরী।

ইহার কারণ এই যে "চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজবন্ধুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু বিশ্বভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতি তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি। অগ্নি বায়ু জল স্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মাদ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা সহরের ইস্কুলে ঠিকমতো সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানা-ঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।"

সুতরাং শিশুর শিক্ষার জন্য যে বিশেষ পরিবেশ চাই, তার চতুর্দিকে বিশ্বপ্রকৃতির যেন গভীর সংযোগ থাকে। কারণ 'মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান।'[১৯]

কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি ছাড়া মনুষ্য-জীবনে অন্য জিনিসেরও প্রভাব আছে। 'মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসমাজ এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়।'[২০]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় ঐ উদ্দেশ্যেই স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামলপ্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে।

১৯। শিক্ষা—পৃঃ ৫৪, ২০। বিশ্বভারতী—পৃঃ ১২১

কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণচিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারিদিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। ......এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্খা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষালাভ করবে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে।"[২১]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশুকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা অসামাজিক পরিবেশে এনে দিলে,—সেই শিক্ষার সাহায্যে কিভাবে শিশু আপনাকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করতে পারে। আবার অনেকে এ কথাও বলতে পারেন যে, বর্তমান সভ্যতা শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতা, শহরেই এই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। সুতরাং শিশুকে যদি সভ্যসমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়—তবে তার শিক্ষা হবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সুতরাং সমাজ থেকে বিছিন্ন করে শিশুকে মানুষ না করে সমাজের মধ্যেই শিশুকে মানুষ করা উচিত। অন্যভাবেও বিষয়টির আলোচনা প্রয়োজন। আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে শহরকে কেন্দ্র করে। "এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে। নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে।" আবার একথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে যে, "যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চারিদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় আর পদার্থ সকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।"

২১। বিশ্বভারতী—পৃঃ ৭৭

এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ...আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (Energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটেনি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগেনি। এই জন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরাভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে।"

বিদ্যালাভ সাধনার বস্তু। যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে সেইখানেই বিদ্যালাভের স্থান। শহরের পরিবেশে এই বিদ্যালাভ সম্ভব নয়। শহরের বিদ্যালয় বিশ্বক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন, সামাজিক বিভেদ বুদ্ধি দ্বারা সংকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, "অন্তত জীবনের আরম্ভ কালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহচালনা ও চারিদিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শিশুরা বঞ্চিত হয়; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের মতো তাদের শিথিল হয়ে যায়।"

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই শহরবাসের দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' নামক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"*প্রশ্রয়প্রাপ্ত যে সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের* সুযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়ে স্বাধীনজীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না; মানুষের পক্ষেও সেই রকম। দেহটাকে সম্যকরূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক 'ভদ্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাজনক তার অভাবদুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি।"

অন্য আর একটি কারণেও শহরের পরিবেশ আমাদের সামাজিক গুণের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। শহরে জনতা আছে বটে কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ থাকে না। ডিউই বলেছেন—যে সমস্ত বস্তু আমাদের মনের গতিকে প্রভাবিত করে তাই আমাদের প্রকৃত পরিবেশ। এই হিসাবে একজন জ্যোতির্বিদের নিকট দূরবর্তী গ্রহাদি তাঁর পরিবেশের অংশ। মনের সঙ্গে পরিপূর্ণ যোগ না থাকলে তাকে আমরা প্রকৃত পরিবেশ বলতে পারি না। শহরের মধ্যে বাস করেই যে আমরা সামাজিক গুণ শিখতে পারি না, প্রকৃত নাগরিকতা অর্জন করতে পারি না, রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করে বলেছেন,—

"সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই, কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা এক হিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত জনতাসমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক একটি রবিনসন্ ক্রুশোর মতো আপনার ফ্রাইডেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এতবড়ো নির্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে।"[২২]

এই জন্য প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শহরের বাইরে আশ্রম-পরিবেশের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলেছেন,—

"আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।" (শিক্ষা—পৃঃ ৫৫)

আবার অন্যত্র বলেছেন,—

"একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে তপোবনের শিক্ষা প্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না।" (বিশ্বভারতী—পৃঃ ৪৯)

কিন্তু শুধু প্রকৃতির পরিবেশেই মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। একমাত্র মানুষের নিকট থেকেই মানুষ শিখতে পারে। এইজন্য

২২। শিক্ষা—পৃঃ ১৫৪

শিক্ষার জন্য যেমন আমাদের বনের প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে গুরুগৃহের। "বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে।" (শিক্ষা—পৃঃ ৫৫)

রবীন্দ্রনাথের এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অনেকে ঠিক ভাবে নিতে পারেন নি। অনেকে কবির কল্পনা বলে উপহাস করেছেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে। তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই। সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে, কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।" (ধর্মশিক্ষা—পৃঃ ১৫৫)

কারণ আশ্রমের পরিবেশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বরং শহরে মানুষ জনতার মধ্যে বাস করেও আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখে। কিন্তু আশ্রম-বিদ্যালয়ে এটি হবার যো নেই।

"একশো-দুশো এক আশ্রমে লইয়া দিন যাপন করাকে কোন মতেই নির্জনবাস বলা চলে না। এই যে একশো-দুশো মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে, ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গে লইলাম, আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এমনটি হইবার যো নাই; এই একশো-দুশো মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে; ইহাদের সমস্ত সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে,—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে এ বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা।" (শিক্ষা—পৃঃ ১৫৫)

সুতরাং যেখানে সমাজের মানুষ নিয়ে একসঙ্গে বাস—সেখানে আলাদা এক সমাজ গড়ে ওঠে,—বৃহত্তর সমাজের বাইরে। এ কোন মতেই সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়।

কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—'সংসারে যেখানে চারিদিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই ওঠা পড়া করিতেছে, সেইখানেই ঠিক সত্য ভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়।' আশ্রম-পরিবেশে আমরা সমাজের ভালটি প্রবর্তন করি, মন্দটিকে উপেক্ষা করি,—এটি কোনক্রমেই সমাজের প্রকৃত পরিবেশ নয়।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত এই যে, সমাজের মানুষ নিয়ে যে আশ্রম তা কোনক্রমেই সমাজের ভালো-মন্দর তরঙ্গের বাইরে যেতে পারে না।

"আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি, সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না, সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না, কারণ ভালো-মন্দ সেখানে এক প্রকার আপোস করিয়া মিলিয়া মিশিয়াই থাকে। এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।" (শিক্ষা পৃঃ ১৫৫)

কিন্তু এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, আশ্রমের পরিবেশে যদি সংসারের ভালমন্দ উভয়েরই প্রভাব থাকে,—তা হলে বিশেষ করে আশ্রম স্থাপনের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। সমাজের মধ্যেই তো শিশু মানুষ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত এই যে—আমাদের 'স্থূল সমাজের' সঙ্গে 'আশ্রম সমাজের' বহুবিধ ঐক্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু উভয়ের

মধ্যে স্বাতন্ত্র্যও আছে। যেখানে তার সূক্ষ্ম জায়গা সেখানেই তার স্বাতন্ত্র্য।

"সেই স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে; সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ—তাহা বাসনার দিকে নয়,—সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি বা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে; সে আপনাকে যদি বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইয়া যাইতেছে; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের উর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।"[২৩]

এই সম্পর্কে 'নানের' বক্তব্যটিও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য সমাজের লক্ষ্য থেকে স্বতন্ত্র। এখানেই বিদ্যালয়ের সমাজের সঙ্গে আমাদের বৃহত্তর জীবনের পার্থক্য। আবার তপোবনকেই আমাদের বর্তমান শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে সৃষ্টি করতে হবে,—কারণ তপোবনের সাধনা ভারতবর্ষের আপন সাধনার সঙ্গে যুক্ত; কারণ ভারতবর্ষ বিশ্বাস করেছে যে, জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির মিলন ঘটিয়ে চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের বোধকে বিশ্বব্যাপী করে তোলা যায়।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা' নামক প্রবন্ধ সংগ্রহে সুন্দর করে বলেছেন।

"এই আশ্রম-বিদ্যালয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানহীন ও তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্বাভাবিক; এই আশ্রম-পরিবেশে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ বাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করে না, সাধনা এখানে কেবল-

---

২৩। শিক্ষা—পৃঃ ১৫৬

মাত্র ধ্যানের মধ্যে বিলীন না হয়ে ত্যাগে ও মঙ্গল কর্মে নিয়তই প্রকাশ পায়। এই আশ্রম-বিদ্যালয় সংকীর্ণ-দেশ কাল পাত্রের দ্বারা কর্তব্য-বুদ্ধিকে খণ্ডিত না করে, বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করে। এই আশ্রম-পরিবেশে পরস্পারের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হয়, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হয়, সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করে ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হয়। এই পরিবেশে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হয় এবং সংযমকে আশ্রয় করে স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশ পায়।

এই আশ্রম-বিত্থালয়ে ছাত্রছাত্রীগণের অধিকার কেবল মাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে—তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার নিয়ে কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবন-চেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করে তোলে।”[২৪]

আমাদের প্রচলিত বিত্থালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্র-পরিকল্পিত আশ্রম-বিত্থালয়ের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিত্থালয়গুলিকে শিক্ষা দেবার কল বলেছেন। “ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দেবার কল। মাস্টার এই কারখানার অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন। ছাত্ররা দুই-চার-পাত কলে-ছাঁটা বিত্থা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় ঐ বিত্থার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।”

দুটি কারণে এই বিত্থালয় আমাদের অভাব মেটাতে পারে না। প্রথমত, কারখানার জিনিসের গঠন একই প্রকারের—একই প্রকারের মার্কা দেওয়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পার্থক্য আছে—এই কলের শিক্ষায় তা ধরা পড়ে না। একই পরিবেশে, একই বিষয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে, আপন

২৪। শিক্ষা—পৃঃ ১৬০

প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, তাই কলের কাছ থেকে মানুষ মনের খাদ্য পেতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, এই বিদ্যালয়রূপ কারখানার সঙ্গে আমাদের সমাজের কোন মিল নেই। এই বিদ্যালয়ে আমরা যে বিদ্যা পাই আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, তার কোন মিল দেখা যায় না।

"বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।"

বিদ্যালয়কে সমাজের মধ্যেই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করতে হবে। আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়গুলি ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার নকল। নকল জিনিসে প্রাণের প্রয়োজন মেটে না। আমাদের দেশে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সময় এই কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে বিলাতের সমাজ আমাদের নয়। আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে—তা ভাল করে বুঝতে হবে। আমরা এতকাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়েছি। সেখানে একমাত্র ইংরাজের দৃষ্টান্তই আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ। এর আড়ালে, আমাদের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয় অস্পষ্ট হয়ে আছে।

"আমাদের মুস্কিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে, তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এদেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না। অথচ ইহাই জানা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।" (শিক্ষা—পৃঃ ৪৮)

বিদ্যালয়কে দিয়ে উপযুক্ত ভাবে তার উদ্দেশ্য সাধন করাতে হলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের সমাজের বিচ্ছেদ দূর করা প্রয়োজন,

বিদ্যালয়কে সমাজের নিকট আনা প্রয়োজন। "এইজন্য এমন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।" (শিক্ষা—পৃঃ ৪৭)

রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেছেন—সংক্ষেপে তা এরূপ। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। ছাত্ররা সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করবে। নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজ নিজেরাই করবে। ঘর পরিষ্কার রাখবে। শয্যা গুছিয়ে রাখবে।

তারপরে তারা তৈরী হবে প্রার্থনার জন্য। ছাত্রধর্ম আলোচনার সময় আমরা প্রার্থনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত উল্লেখ করেছি। তিনি তাঁর 'Personality' নামক পুস্তকে বলেছেন,—

"I believe in the hour of meditation, and I set aside fifteen minutes in the morning and fifteen minutes in the evening for that purpose. I insist on this period of meditation, not, however, expecting the boys to be hypocrites and to make believe they are meditating. But I do insist that they remain quiet, that they exert the power of self-control, even though instead of contemplating on God, they may be watching the squirrel running up the trees."[২৫]

সাধারণ বিষয়ে পাঠগ্রহণ ছাড়াও বিদ্যালয়ে ছাত্রদের দ্বারা ফসল উৎপাদনের জন্য কিছু ফসলের জমি থাকবে। এই জমি থেকে বিদ্যালয়ের আহার্য কিছু অংশে সংগ্রহ করা যেতে পারে। একজন লোক রাখা যেতে পারে চাষবাসের জন্য, কিন্তু ছাত্ররা সকলেই চাষের কাজে সাহায্য করবে।

দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকবে এবং গোপালনে ছাত্ররা যোগ দেবে। পাঠের বিশ্রামকালে ছাত্ররা স্বহস্তে বাগান করবে, গাছের

২৫। *Personality*—Page 145

গোড়া খুঁড়বে, গাছে জল দেবে, বেড়া বাঁধবে। 'এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধ পাতাইবে।'

বিদ্যালয়ের পাঠদানের ক্লাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাশ বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র পরিচয়ে, সংগীত চর্চায়, পুরাণ কথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।"

বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই পরিবেশের প্রভাবেই ছাত্ররা শিক্ষার জন্য একটি তাগিদ অনুভব করবে। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন।

"When I first started my school my boys had no evident love for music. The consequence is that at the begining I did not employ a music teacher and did not force the boys to take music lessons. I merely created opportunities when those of us who had the gift could exercise their musical culture. It had the effect of unconsciously training the ears of the boys. And when gradually most of them showed a strong inclination and love for music I saw that they would be willing to subject themselves to formal teaching, and it was then that I secured a music teacher."[২৬] (My School)

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযোগী একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করা। সেই শিশু ভাগ্যবান যে জীবনের প্রথম থেকেই গৃহে ও বিদ্যালয়ে নিজের বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া পায়। সঙ্গীত সম্পর্কে যে নিয়ম অন্য বিষয় সম্পর্কেও সেই নিয়ম। যে বিদ্যালয় এই দায়িত্ব পালন করতে পারে না,—শিশুর বিকাশে তার অংশ খুব বেশী হতে পারে না।

২৬। *Personality*—Page 146

রবীন্দ্রনাথের মতে এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি, টেবিল, চৌকির প্রয়োজন নেই। আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের দরিদ্র অবস্থা বিবেচনা করে এই ব্যবস্থা সমীচীন সন্দেহ নেই। অধিকন্তু আমাদের দেশ শীতের দেশ নয়, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসতে পারি না, অথচ পর-দেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করে কষ্ট বাড়িয়ে তুলছি। "অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। ধনী য়ুরোপের মত আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার।"

রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার, মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা,—এগুলি কম ক্ষমতা নহে এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের জটিলতা, বর্বরতা; বস্তুত তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এই শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা।"[২৭]

ধনী সমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব তারা উপকরণের আড়ালে চাপা দিয়ে রাখে। আমরাও তেমনি শিক্ষার মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে উপকরণের আড়ালে আমাদের কাজের অপটুতাকে আড়াল করে রাখতে চাচ্ছি। আবার উপকরণ বাহুল্যে আমাদের মনের নৈপুণ্য ব্যহত হয়। "একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিষ। সেই মনকে মুক্ত

২৭। শিক্ষা—পৃঃ ৫৭

করা চাই। কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তু-লুব্ধতা থেকে।"[২৮]

অপরাধ করলে ছাত্ররা আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করবে। 'শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন'। দণ্ড স্বীকার করা ছাত্রদের যে নিজেদেরই কর্তব্য এবং এই স্বীকার না করলে যে মনের গ্লানি মোচন হয় না,—এই শিক্ষা বাল্যকাল থেকেই হওয়া চাই। 'পরের নিকট নিজেকে দণ্ডনীয় করবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।'

বিদ্যালয়ে শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা বর্বরোচিত। সুতরাং আশ্রম-বিদ্যালয়ে এই শাস্তিদানের কোনরূপ ব্যবস্থাই থাকবে না। এই নিয়ম আশ্রমের পবিত্র পরিবেশের অংশস্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন,—

"For the most important element of it is the atmosphere, and the fact that it is not a school which is imposed upon the boys by autocratic authorities. I always try to impress upon their minds that it is their own world, upon which their life ought fully and freely to react. In the school administration they have their place and in the matter of punishment we mostly rely upon their court of justice."[২৯]

প্রচলিত বোর্ডিংস্কুলের সঙ্গে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পার্থক্য আছে। বোর্ডিং স্কুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং-ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়—তাহা বারিক, পাগলাগারদ, হাঁসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠী-ভুক্ত।" বোর্ডিংস্কুল বিলাতের জিনিস, আশ্রম ভারতের নিজস্ব। এই আশ্রম-বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান দিনের মধ্যে কেবল কয়েকঘণ্টার

২৮। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—পৃঃ ৩৪,

২৯। *Personality*—Page 146

ব্যাপার নয়; এখানে শিক্ষাদান চলে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, নানা কর্মে ও আলোচনায় এবং গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এই বিদ্যালয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Where the young and the old, the teacher and the student, sit at the same table to pertake of their daily food and the food of their eternal life."[৩০]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সহশিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থাটি স্বাভাবিক—কারণ বিদ্যালয়কে যদি সমাজের নিকটে আনয়ন করতে হয়, তবে সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশটিও বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করতে হবে। বিদ্যালাভে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন,—বিশেষ করে বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কে এই পার্থক্য তিনি স্বীকার করেছেন। সমাজেও এই পার্থক্য আছে।

শিক্ষার প্রথম অবস্থায় কোন বিশেষ জীবিকা অনুযায়ী শিক্ষা দেবার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার এইরূপ কোন 'বিশেষ উদ্দেশ্য' থাকা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের অনুকূল নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করে তবে শিশুকে বিভিন্ন জীবিকার উপযোগী করে প্রস্তুত করা যেতে পারে।

কিন্তু এই সাধারণশিক্ষা বলতে রবীন্দ্রনাথ সমাজের অর্থনৈতিক কর্মসমূহের সঙ্গে বিচ্ছেদ বোঝান নি। দেশের অর্থনীতির সঙ্গে পরিপূর্ণ সংযোগ ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয় থাকবে সমাজের কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রস্থলে। এস্থানে ছাত্ররা যেমন বিভিন্ন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে, তেমনি দেশের বিভিন্ন প্রকারের জীবনযাত্রার সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় স্থাপন করবে।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"Education should not be dragged out of its native element, the life-current of the people.

৩০। *Personality*—Page 148

Economic life covers the whole width of the fundamental basis of society, because its necessities are the simplest and the most Universal. Educational institutions, in order to obtain their fulness of truth, must have close association with the economic life....

Our centre of culture should not only be the centre of the intellectual life of India, but the centre of economic life also. It must co-operate with the villages around it, cultivate land, breed cattle, spin cloths, press oil from oil-seeds ; it must produce all the necesssaries, devising the best means, using the best materials and calling science to its aid."[৩১]

উপরে রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেছেন তা বর্ণনা করা হল। প্রচলিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার সঙ্গে এর কিছু মিল আছে এ কথা কেউ কেউ মনে করতে পারেন। কিন্তু লেখকের মনে হয় উভয় পরিকল্পনার মধ্যে আদর্শের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনার অবকাশ আছে।

বর্তমানে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। রবীন্দ্রনাথ এদের কারখানা বলেছেন। এইগুলির উদ্দেশ্য ছাত্রদের পরীক্ষায় পাশ করানো এবং চাকুরীজীবনের উপযুক্ত করা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে এবং শিক্ষাসংস্কারের কথা চলছে। আজ দেশের প্রকৃত বিদ্যালয়ের রূপ ও প্রকৃতি কিরূপ হবে—এই নিয়ে আলোচনার সুযোগ এসেছে। আমাদের মনে হয় স্বাধীন ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করবে—তার রূপ নির্ধারণের জন্য আমাদের বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের উপর নির্ভর করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। আশা করি লেখকের এই মন্তব্য রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

৩১। *Creative Unity*—Page 200

পরিশিষ্ট—১

কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের তালিকা

* অবকাশ (Space)
আত্মসাম্মুখ্য (Self assertion)
* আঙ্গিক (Technique)
আত্মবোধ সম্পন্ন বিশেষ রস (Self regarding sentiment)
উদ্দীপক (Stimulus)
* উজ্জ্বলতা (Illumination)
কল্পনাবিলাস (Imagination)
কর্মের মাধ্যমে (Learning by doing)
কৌতূহল (Curiosity)
খেলাচ্ছলে (Playway)
গতীয় (Dynamic)
গাণিতিক নিয়ম (Mathematical Law)
গ্রাহক যন্ত্র (Receptors)
* চিত্রবস্তুর সংস্থান (Composition)
ছাত্র স্বরাজ (Self Government in school)
* ছবির ম্যুজিয়ম (Picture Gallery)
তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)
* দেয়াল সংবাদ পত্র (Wall News Paper)
ধর্মীয় (Spiritual)
নির্গুণ সত্তা (Absolute Being)
* নৃতত্ত্ব (Ethnology)
পরিবেশ (Environment)
পরীক্ষামূলক আত্মগঠন (Experimental self building)
পরীক্ষামূলক মনস্তত্ব (Experimental Psychology)
পাঠ্যবিষয় (Curriculum)
প্রতিষ্ঠান, অঙ্গ (Institution)
প্রয়োগবাদী (Pragmatist)
প্রতিক্রিয়া (Reaction)
প্রকৃত আত্মগঠনমূলক কর্ম (Serious business of self building)

প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method)
শৈপ্রতি (Energy)
বর্ণভিত্তিক পদ্ধতি (Alphabet Method)
* বর্ণকল্পনা (Colour Scheme)
বুনিয়াদী বা মূলজ্ঞান (Key Knowledge)
বৃদ্ধি (Growth)
বিকাশ (Development)
বিস্ময়ের পর্যায় (Wonder Stage)
বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytic Method)
বেষ্টনী (Surroundings)
ব্যর্থ আত্মানুভূতি (Negative self feeling)
ভাববাদী (Idealist)
মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psychological Method)
মানসিক (Mental)
মায়ের খেলা (Mother play)
* ম্যুজিয়ম্ (Museum)
যন্ত্র (Apparatus)
যৌক্তিক পদ্ধতি (Logical Method)
রচনাভিত্তিক পদ্ধতি (Story Method)
হিউরিস্টিক পদ্ধতি (Heuristic Method)
শিক্ষা-দর্শন (Educational Philosophy)
শিক্ষাবিধি অথবা শিক্ষাপদ্ধতি (Method of Teaching)
শিক্ষার ভিত্তি (Foundation of Education)
শারীরিক (Physical)
সার্থক আত্মানুভূতি (Positive self feeling)
সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science)
সামগ্রিক পদ্ধতি (Global Method)
* সজীব সংবাদ পত্র (Living News Paper)
সংশ্লেষণ পদ্ধতি (Synthetic Method)
স্বভাববাদী (Naturalist)
সূত্র (Formula)

স্থাণুনীতি (Static)
স্তর বা সোপান (Stage)
* স্থানিকতথ্য সন্ধান (Region Study)
জ্ঞানেন্দ্রিয় (Senses)

পরিশিষ্ট

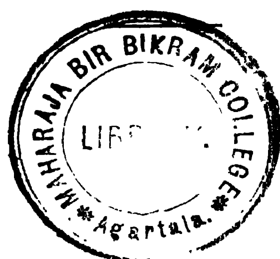
রবীন্দ্রনাথ — আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (বিশ্বভারতী)
ইতিহাস ,,
জীবন স্মৃতি ,,
ধর্ম ,,
ডাকঘর ,,
পথের সঞ্চয় ,,
বিচিত্র প্রবন্ধ ,,
বাঙ্গালা ভাষা পরিচয় ,,
বিশ্বভারতী ,,
রাশিয়ার চিঠি ,,
লিপিকা ,,
শিক্ষা ,,
শিক্ষার ধারা (The New Education Fellowship)
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম (প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যাবলী)
শান্তিনিকেতন
শিশু (বিশ্বভারতী)
শিশু ভোলানাথ
সংকলন

---

* রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ও ব্যবহৃত।

	Creative Unity (Macmillan & Co. Ltd.)
	Personality ,,
	The Religion of Man (George Allen & Unwin Ltd., London.)
প্রমথনাথ বিশি	রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)
	শিক্ষাব্রতী (রবীন্দ্র সংখ্যা)
ক্ষুদিরাম দাস	রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় (পুঁথিঘর, কলিকাতা)
Herbert Spencer	Education (Walts & Co, London)
J. Dewey	Democracy and Education
,,	School and Society (U. C. P.)
,,	Human Nature and Conduct.
J. S. Ross	Ground work of Educational Theory.
J. J. Findley	The Foundation of Education (Vol. 2)
J. W. A. Young	The Teaching of Mathematics
K. K. Mookherjee	New Education and its aspects.
M. R. Paranjpe	A Source Book of Modern Indian Education (Macmillan & Co.)
Sir Percy Nunn	Education, its data and first Principles (Edward Arnold & Co.)
	The Visva-Bharati Quarterly : Education Number, 1947

নির্ঘণ্ট


MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
Agartala